স্বার্থপর

নিমাই ভট্টাচার্য

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা — ৬

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৬১

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, বাণী-শ্রী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীসরিৎ দত্ত

বন্ধুবরেষু

জীবনের সব বিশেষ ঘটনাই হঠাৎ ঘটে যায়। সুদীপ্ত কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবে নি, তার মত বাউণ্ডুলে ভবঘুরে বেকার ছেলেকে কেউ কোনোদিন ভালবাসতে পারে।

বোস পাড়া লেনের এই বাড়িতে ওর জন্ম না হলেও খুব ছোটবেলা থেকেই আছে। আশেপাশে বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলা ঝগড়াঝাঁটি করতে করতে বড় হয়েছে। শুধু বিমান আর সমর না, জয়শ্রী আর নিবেদিতাও ইনফ্যাণ্ট থেকে ক্লাশ ফোর পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছে। সেই জয়শ্রীকে এখন দেখলে সুদীপ্ত অবাক হয়ে যায়।

হঠাৎ মুখোমুখি হলে কথা বলতেও লজ্জা করে।

কিরে সুদীপ, কথা না বলেই চলে যাচ্ছিস? জয়শ্রীই হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে।

সুদীপ্ত নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, না, মানে একটু অন্যমনস্ক ছিলাম।

কেমন আছিস?

এবার সুদীপ্ত না হেসে পারে না। বলে, কলকাতার বেকাররা ভালই থাকে।

তার মানে?

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, পি. কে-অমল দত্ত, কপিল-গাভাসকার, ইন্দিরা গান্ধী-জ্যোতি বোস, সত্যজিৎ-মৃণাল সেন ছাড়াও মিছিল-মিটিং-ট্রাফিক জ্যাম, কালীপুজো-দুর্গাপুজো-সরস্বতীপুজো নিয়ে আমরা বেশ ভালই থাকি।

জয়শ্রী হাসে।

সুদীপ্ত আবার বলে, এইসব হাজার কাজের মাঝে সময় পেলে

জি. পি. ও'র সামনে গিয়ে দু'চারটে ফর্ম কিনে ফিল-আপ করে পাঠিয়ে দিই।'

তোর কথা শুনতে ভারী মজা লাগে।

'সুদীপ্ত এগুতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে বলে, সামনের জন্মে ডেফিনিটলি মেয়ে হয়ে জন্মাব।

কেন? জয়শ্রী হাসতে হাসতেই জানতে চায়।

কেন আবার? তোর মত বিয়ে করে স্বামীর পয়সায় মহাসুখে থাকব।

নিবেদিতা তো বিয়ের পর বিলেতেই চলে গেল। প্রায় তিন বছর পর গত পুজোর সময় এসেছিল। ওকে দেখেই সুদীপ্ত বলে, তুই কি দারুণ সুন্দরী হয়েছিস রে!

কেন বাজে বকছিস?

সত্যি বলছি, তোকে হঠাৎ দেখলে ফিল্ম এ্যাকট্রেশ মনে হয়। প্রায় না থেমেই ও বলে যায়, আর হবি না কেন? বিলেতে তো তেলাপিয়া মাছ খেয়ে বেঁচে থাকতে হয় না।'

সুদীপ্ত এই ধরনেরই কথাবার্তা বলে। সবার সঙ্গে। তা সে ছেলে-মেয়ে যেই হোক।

বাগবাজারের এই অঞ্চলে গায়-গায় বাড়ি। এক বাড়ি থেকে পাঁচ বাড়ির কথাবার্তা শোনা যায়। ভিতরের বারান্দায় দাঁড়ালে পিছনের দু'তিনটে বাড়ির ঘরদোর থেকে কলতলা পর্যন্ত দেখা যায়। নন্দুর বড় জ্যেঠিমা যে প্রায় ন্যাংটা হয়ে চান করেন, তা কে না দেখেছে? আগে সুদীপ্ত বাবার ঘরে বসে পড়তে পড়তেই চীৎকার করে অলকের কাছ থেকে অঙ্কের উত্তর জেনে নিত। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মুখ ধুয়ে গামছায় হাত মুছতে মুছতেই সুদীপ্তর মা ডান দিকে ফিরে বলেন, এই কমলা, পান খাবি তো ছাদে আয়।

কমলা মাসী রান্নাঘরে খেতে খেতেই পিছন ফিরে বলেন, হ্যারে মায়া, তোর খাওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, কেন? মানুষটাকে দেখা না গেলেও পশ্চিমদিকের বাড়ি থেকে উত্তর আসে।

তুই ছাদে যা। মেজদির খাওয়া হয়ে গেছে। আমি একটু পরেই আসছি।

ভাঙা-ভাঙি আর ভাগাভাগির কল্যাণে কোনো বাড়ির ছাদই বড় না। সবারই এক চিলতে ছাদ। এক ছাদ থেকে অন্য ছাদ টপকাতে টপকাতে বোধহয় শ্যামবাজারের মোড় পৌঁছে যাওয়া যায়। এই ধরনের একটা পাড়া নিয়েই তো নরেন মিত্তির একটা উপন্যাস লিখেছিলেন।

গায়-গায় লাগা বাড়ি হলে যা হয় আর কি! ছেলেমেয়েরাও সবাই সবাইকে চেনে, জানে। খুব ভাল করেই চেনে ও জানে। শুধু তাই নয়। সবাই সবার খবর রাখে। তা সে ভাল-মন্দ যাই হোক। প্রায় রোজ রাত্তিরেই নন্দবাবু বমি করেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ির মিত্তির মাসীমা বলেন, এই বাণী, ছোড়দার কি আজোও অম্বলের ব্যথা উঠেছে?

বাণীর মা জবাব দেন, আর বলো না ভাই! এ রোগের হাত থেকে কি মুক্তি নেই?

এ পাড়ায় কারুর কোনো খবর লুকিয়ে রাখার উপায় নেই। অসম্ভব। কে মদ খায়, কে বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়, কার ছেলেমেয়ে ঠিকসময় পড়াশুনো করে, কে কার বউয়ের জন্য রোজ অফিস থেকে ফেরার সময় গরম কচুরি নিয়ে আসে। সব কিছু। নগেন বাড়ুজ্যে যে রেগে গেলে অত্যন্ত অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেন, তাও সবাই জানে। বিভাসদা আর মীরাদির লুকিয়ে প্রেম করার খবরও চাপা নেই। এরই মধ্যে সুদীপ্ত আর মালার প্রেমের কথা কেউ জানতে পারল না?

না, কেউ জানতে পারে নি। যখন খবরটা জানাজানি হলো, তখন বোধহয় ওদের শুধু বিয়ে না, ফুলশয্যাও শুরু হয়ে গেছে।

সেই দুপুরবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাচ্ছি বলে বেরিয়েও রাত দশটার সময়ও যখন মালা ফিরল না, তখন শুধু ওদের

বাড়ির লোকজনই না, সারা পাড়ার সবাই চিন্তিত হন। এ-বাড়ি-ও-বাড়ি থেকে সবাই জিজ্ঞেস করেন, হ্যারে কমলা, মালা ফিরেছে?

না দিদি, এখনও ফেরে নি।

এদিকে দীপুও ফেরে নি।

সুদীপ্তর মাকে কমলা সান্ত্বনা দেন, দীপু কোথায় আড্ডায় মেতে গেছে বলেই ফিরতে দেরি হচ্ছে কিন্তু মালা তো জীবনে কোনোদিন এত রাত করে না।

আমিও তো তাই ভাবছি।

পাড়ার ছেলেরাই দু'চার জায়গায় ছোটাছুটি করল। মালার বাবা ত্রিদিববাবু উকিলের বাড়ি থেকে কয়েক জায়গায় টেলিফোনও করলেন, কিন্তু না, ওসব জায়গায় মালা যায় নি।

সাড়ে দশটা, এগারোটা, সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। সারা পাড়ায় তখন সবার মুখেই ঐ একটা আলোচনা, মালা কোথায় গেল? অনেকে আবার বলাবলি করেন, কোনো এ্যাকসিডেন্ট হয়নি তো?

না, না, হাসপাতালে খবর নেওয়া হয়েছে।

কেউ কিডন্যাপ করে নি তো? কিচ্ছু বলা যায় না। যা দিনকাল পড়েছে।

আচ্ছা দীপুও তো এখনো ফিরল না!

তবে কি....

এমনসময় উকিলবাবুর মেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে কমলাকে খবর দিল, মাসীমা, এক্ষুণি মালা ফোন করে বলল, ও দীপুদাকে বিয়ে করেছে। বাড়ি ফিরবে না।

কমলা হাজার প্রশ্ন করেন, কোথা থেকে ফোন করল? আর কি বলল? কোথায় আছে? কে বিয়ে দিল? আরো কত কি!

শুধু এই দুটো কথা বলেই ও ঝপাং করে টেলিফোন কেটে দিল।

আগুনের মত কথাটা সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল। সবাই বলাবলি করেন, দীপু তো এ ধরনের ছেলে ছিল না! তাছাড়া বেকার। বিয়ে করে বউকে খাওয়াবে কি? আচ্ছা মালার কি এমন বয়স হয়েছিল?

এই বয়সেই প্রেম করে বিয়ে করতে হবে ?

বঙ্কুদার রকে বসে পান-জর্দা চিবুতে চিবুতে কালোদা গম্ভীর হয়ে বললেন, ওরে বাপু, প্রেম আর ঝড় কখন কোথায় শুরু হবে আর শেষ পরিণতি কি হবে, তা কেউ বলতে পারে না।

কালোদা ঠিকই বলেছেন। কর্পোরেশন আর পোস্টঅফিসের হিসেব মত দুটো বাড়ির মাঝখানে আরও তিনটে বাড়ি আছে। দুটো বাড়িতে ঢোকার রাস্তাও দু'দিক দিয়ে, একটা দক্ষিণ দিক থেকে, অন্যটা পশ্চিম দিকে কিন্তু দুটো বাড়ির পিঠে পিঠ লেগে আছে। ছাদের সিঁড়ির এক চিলতে জায়গায় সুদীপ্ত নিজের আশ্রম তৈরি করেছিল। কলেজে ওঠার পর থেকেই ও ওখানে থাকত। পড়াশুনো, শোয়া-বসা, আড্ডা, সবকিছু। ওখানকার ছোট্ট জানলার প্রায় সামনেই ছিল মালার বাবা-মার ঘর। পড়াশুনো কাজকর্মের ফাঁকেই মালা ঐ ঘরে এলেই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সুদীপ্তর সঙ্গে কথাবার্তা বলতো, কি সুদীপদা, এত মন দিয়ে কি লিখছ ?

চিঠি।

কাকে চিঠি লিখছ ?

তোকে।

মালা হো হো করে হাসতে হাসতে বলে, তুমি যেদিন আমাকে চিঠি লিখবে, সেদিন আর সূর্য পূবদিকে উঠবে না।

সুদীপ্ত একটু হাসি চেপে বলে, সত্যি তোকে চিঠি লিখছি।

বাজে বকো না।

সত্যি বলছি। কাল সকালের ডাকেই চিঠি পেয়ে যাবি।

মালা আবার হাসে। বলে, আমার চিঠি তুমি ডাকে দেবে নাকি ?

নিশ্চয়ই।

হাতে হাতেই চিঠি দাও না।

হাতে হাতে চিঠি দিলে কি চিঠির গুরুত্ব থাকে ?

পরের দিন সকালের ডাকে যখন সত্যি সত্যি চিঠি এসে হাজির

তখন মালা অবাক না হয়ে পারে না কিন্তু চিঠি পড়ে ওর কি হাসাহাসি!

কমলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন, এত হাসছিস কেন?

মালা হাসতে হাসতেই বলে, সুদীপদা আমাকে চিঠি লিখেছে।

আমাদের সুদীপ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। আবার কোন সুদীপ?

তা এত হাসছিস কেন?

মালা চিঠিটা ওর হাতে দিয়ে বলে, পড়ে দেখ।

চিঠিটা পড়ে উনিও হাসতে শুরু করেন। আপন মনেই বলেন, কি মজার ছেলে বাবা!

কমলা সঙ্গে সঙ্গে ছাদ টপকে সুদীপ্তদের বাড়ি গিয়ে ওর মাকে বলেন, মেজদি, তোমার ছেলে মালাকে চিঠি লিখেছে।

সুদীপ চিঠি লিখেছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

মালাকে?

হ্যাঁগো হ্যাঁ।

ওর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

কি লিখেছে শুনবে?

কি লিখেছে?

লিখেছে, মালা, আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়ে তোমার দিন ভালভাবেই কাটছে। রূপচর্চা ও কেশচর্চায় আরও মনযোগ দিলে পরীক্ষার ফল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ভাল হবে। মাসীমা কেমন আছেন? তাঁকে অনেকদিন দেখি না। ক'দিন আগেই স্বপ্ন দেখলাম, মাসীমা আমাকে অত্যন্ত আদর করে লুচি-মাংস খাওয়াচ্ছেন। আহা! স্বপ্ন যদি বাস্তব হয়, তাহলে কি মজাই হবে!

সুদীপ্তর মা হাসতে হাসতে বলেন, কি ছ্যাংলা ছেলে বাবা!

এতে ছ্যাংলামীর কি আছে মেজদি? ছেলেটা লুচি-মাংস খেতে ভালবাসে বলেই তো লিখেছে!

ঠিক এই সময় মালা ঘরে ঢুকেই বলে, আচ্ছা মাসীমা, আমার বিষয়ে

কি লিখেছে দেখেছেন ?

সুদীপ্তর মা কিছু বলার আগেই কমলা বলেন, সুদীপ্ত ঠিকই লিখেছে।

তাতো বটেই! আজ সুদীপদা বাড়ি ফিরুক, তারপর মজা দেখাচ্ছি। মালা যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনই চলে যায়।

সুদীপ্তর কাণ্ডকারখানাই এইরকম। সবই খোলাখুলি ব্যাপার। বন্ধুদাদের রকে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবার সময় মালা সেজেগুজে বেরুলেই ও ডাক দেয়, এই মালা, শোন।

মালা ওর সামনে এসে বলে, বলো কি বলবে।

তোর কি ধারণা কলকাতা শহরের সব ছেলে-ছোকরারা আমাদের মত সাধু ?

তার মানে ? ওর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে মালা জিজ্ঞেস করে।

একে তো তুই বেশ সুন্দরী। তার ওপর যদি সেজেগুজে রাস্তাঘাটে ঘোরাঘুরি করিস, তাহলে আমাদের মত সাধু-সন্ন্যাসীদেরই মাথা····

মালা মুখ টিপে হাসতে হাসতে পা বাড়িয়েই বলে, মেয়েদের দিকে হাঁ করে না চেয়ে থাকলেই পারো!

সুদীপ্তর কথা শুনে ওর বন্ধুদের সেকি হাসাহাসি! হাসি থামলে বিমান ওকে বলে, মালাকে কথাগুলো বললি কি করে ?

কেন ? কোনো মিথ্যে কথা বলেছি ?

অলক বলল, তুই ঠিক বলেছিস। চোখের সামনে ওরা এইভাবে সেজেগুজে ঘোরাঘুরি করলে সত্যি মেজাজ বিগড়ে যায়।

সুদীপ্ত বলে, আর ভেবে দেখ, আমি আমার আশ্রমে বসে ওকে সারাদিনে একশ'বার দেখতে পাই।

বিমান বলে, তুই বোধহয় অনেক ভেবেচিন্তেই ঐ ছাদের সিঁড়িতে আশ্রম খুলেছিস, তাই না।

আমি তো ওখানে আশ্রম খুলেছি তোদের সুবিধের জন্য।

তা তো বটেই!

আশ্চর্য ব্যাপার সুদীপ্তর এইসব ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবরাও আগে থেকে

কিচ্ছু বুঝতে পারেনি। দুজনে মিলে একসঙ্গে সিনেমা দেখে না, ভিক্টোরিয়া বা ইডেনে পাশাপাশি বসে গল্প করে না, গঙ্গায় নৌকো চড়েও না। একেবারে বিয়ে!

কালোদা নির্বিকার চিত্তে রায় দিলেন, ওরে, তোরা কেউ খেলা দেখিস নি বলে কি মনে করছিস, ওরা কোয়ার্টার ফাইন্যাল-সেমিফাইন্যাল না খেলেই ফাইন্যালে উঠল? তাছাড়া ভুলে যাস না, বাঙালী ছেলেমেয়েরা জীবন-যুদ্ধে বার বার হেরে গেলেও প্রেম-যুদ্ধে ওরা ওয়ার্ল্ড কাপ জিততে পারে!

কালোদা যাই বলুন পাড়ার সবাই বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। সবার মনেই এই প্রশ্ন, শেষ পর্যন্ত সুদীপ মালাকে নিয়ে চলে গেল? যত ভদ্র সভ্যই হোক, ছেলেটা তো বেকার! ক'দিন স্ফূর্তি করে যদি মেয়েটাকে ছেড়ে দেয়, তাহলে? তাছাড়া এই নেশা ক'দিন থাকবে?

সুদীপ্তর মা চোখের জল মুছতে মুছতে কমলাকে বললেন, শেষ পর্যন্ত আমার ছেলে তোদের এই সর্বনাশ করল, তা আমি ভাবতে পারছি না। আমি কি করে আমার দেওরের কাছে মুখ দেখাব বলতে পারিস?

মেজদি, তোমার এই কষ্টের জন্য তো আমার মেয়েও দায়ী। শুধু সুদীপকে দোষ দিয়ে কি হবে? কমলা একটু হেসে বলেন, আমার দুঃখ শুধু একটাই। আজকাল তো হরদম ছেলেমেয়েরা নিজেরাই পছন্দ করে বিয়ে করছে। তোদের যদি এতই বিয়ের সখ, তাহলে এই কেলেঙ্কারী না করে বিয়ে করা যেত না?

হাজার হোক কলকাতার শহর। এখানে নিজের সংসারের ত্রুটি-বিচ্যুতির চাইতে পরের সংসারের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী বা অঘটন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করতে মানুষ বড় ভালবাসে। যেসব আত্মীয়-স্বজনরা কস্মিনকালেও আসা-যাওয়া করেন না, তারাও হঠাৎ আসতে শুরু করলেন এই দুই সংসারে। আমি শুনে তো স্তম্ভিত। এমন

কেলেঙ্কারী কোনো ভদ্রলোকের সংসারে হয়? এই কেলেঙ্কারীর খবর ছড়িয়ে পড়লে আমাদের মুখ দেখানোই মুস্কিল হবে। কেউ বললেন, এই ঘটনার পর আমাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়াই অসম্ভব হয়ে উঠল। দু'চারজন সব জেনেশুনেও ন্যাকামী করে জিজ্ঞেস করেন, যা শুনছি, তা কি ঠিক? আমার তো বিশ্বাসই হয় না, তোমাদের ছেলেমেয়েরা এই জঘন্য কাজ করতে পারে। কাটা ঘায় নুনের ছিটে দেবার জন্য কয়েকজন এমন সান্ত্বনা দিলেন যে ওদের কথা শুনে গা জ্বলে যায়। কিন্তু দুটি পরিবারকেই সবকিছু নীরবে সহ্য করতে হয়। না করে উপায় কী?

বিমান বলল, শালা সুদীপটা আমাদেরও ডুবিয়ে গেল। এখন পাড়ার সবাই ভাবছে, আমরাও এক একজনকে নিয়ে কবে যে কেটে পড়ব, তার ঠিক নেই।

সমর বলল, ঠিক বলেছিস। আজ সকালে আমি রেখার কাছ থেকে ইকনমিক্স বইটা চাইতে গেলে ওর মা কিভাবে ভাগিয়ে দিলেন, ভাবতে পারবি না।

বোসপাড়ার মেয়েরাও বেশ বিপদে পড়েছে। ওরা স্কুল-কলেজে ঠিকই যাচ্ছে কিন্তু পাঁচ মিনিট দেরী করে বাড়ি ফিরলেই বকুনি শুনতে হচ্ছে। বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে যাওয়া তো দূরের কথা, পাশের বাড়িতে কারুর কাছে যাওয়া বন্ধ।

সুদীপের ভাই প্রদীপ তো স্কুলে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। সারা স্কুলের সবাই ওকে টিটকিরি দিচ্ছে, কিরে, তোর দাদা শেষ পর্যন্ত একটা মেয়েকে নিয়ে কেটে পড়ল? তুই কবে কাকে নিয়ে কেটে পড়বি?

সত্যিই তো, দিনের পর দিন এইসব শুনতে কারুর ভাল লাগে!

এদিকে যখন এই অবস্থা, ওদিকে সুদীপ আর মালা তখন সারা পৃথিবীকে ভুলে নিজেদের নিয়ে মত্ত প্রমত্ত হয়ে নৈনিতালে দিন কাটাচ্ছে।

॥ দুই ॥

সব প্ল্যান ও বিধিব্যবস্থা আগেই ঠিক করা ছিল। সুদীপ বারোটার মধ্যে বেরিয়ে পড়বে। সঙ্গে নিজের কয়েকটা জামা-প্যান্ট খবরের কাগজে মুড়ে নেবে। তারপর ম্যারেজ রেজিস্টারের বাড়ি গিয়ে নতুন সুটকেসে সেগুলো ভরে নিয়ে ঠিক দুটোর সময় মানিকতলার মোড়ে ছায়া সিনেমার সামনে দাঁড়াবে। মালা এলে দু'জনে একসঙ্গে হাওড়া স্টেশন। তিনটে পনেরোর বর্ধমান লোক্যাল, ভায়া এইচ. বি. কর্ড। মেন লাইনের বালী-উত্তরপাড়া-শ্রীরামপুর বা ব্যাণ্ডেল স্টেশনে কখন কার সঙ্গে দেখা হবে, তা কি বলা যায়?

ডুন এক্সপ্রেসের টিকিট আগেই কাটা আছে। সুদীপ কাউন্টারের ভদ্রলোককে বার বার বলেছে, দাদা, বিয়ের পর হনিমুনে যাব। দয়া করে একটা কূপে দেবেন।

ভদ্রলোক ওর কথা শুনে হেসেছিলেন।

সুদীপ আরো বলেছিল, দাদা, আমি থাকি বর্ধমানে। ট্রেনে উঠবও বর্ধমানে। ওখানেও টিকিট কাটা যায় কিন্তু শুধু একটা কূপের জন্য কলকাতায় এলাম। দয়া করে একটু দেখবেন।

কাউন্টার ক্লার্ক চাপা হাসি হেসে বলেছিলেন, আশা করি কূপে পাবেন।

ট্রেনে উঠব বর্ধমানে। কাইণ্ডলি নোট করে নেবেন।

ঠিক আছে।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বর্ধমানে পৌঁছে একটু চা-টা খেয়েই মালার দু'তিনটে শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ ছাড়াও সতরঞ্চি-চাদর-বালিশ কিনতে হবে। তারপর কোন হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করে স্টেশনে এসে ওয়েটিং রুমে বসে বিশ্রাম করবে। তবে স্টেশনে যাবার আগে এক ফাঁকে মালার সিঁথিতে সিঁদুর আর হাতে শাখা পরিয়ে দিতে হবে।

ওয়েটিং রুমে বসে উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠায় সময় যেন কাটে না।

এক একটা মিনিটকে যেন এক একটা ঘণ্টা মনে হয়। এরই মধ্যে দিল্লী-কালকা মেল এসে হাজির। সুদীপ চাপা গলায় বলল, এই শুরু হল। এবাব কিছুক্ষণ পব পরই এক একটা মেল-এক্সপ্রেস ট্রেন আসবে।

মালাও খুব চাপা গলায জিজ্ঞেস করে, আমাদের রিজার্ভেশন ঠিক থাকবে তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কালকা মেল চলে যেতেই দু'জনে চা খায়। সুদীপ সিগারেট ধরায়। শেষ করে। পনের-বিশ মিনিট পব আবার সিগারেট ধরায়। এরই মধ্যে দার্জিলিং মেল-অমৃতসর মেল চলে যায়।

চা খাবে? সুদীপ জিজ্ঞেস করে।

না, আমি আর খাব না। তুমি খাও।

সুদীপ প্রায় কানে কানে ফিস ফিস করে বলে, চা খাও। আজ বাত্তির জাগতে হবে না?

মালা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু হাসে।

হ্যাঁ, আবাব ওরা দু'জনে চা খায়। সুদীপ সিগারেট ধরায়।

চা খাবাব সময়ই বোম্বে মেল চলে গেছে। এবার দানাপুব ঢুকল।

ক'টা বাজল? মালা প্রশ্ন কবে।

প্রায় সাড়ে দ'শটা।

আরো এক ঘণ্টা!

সুদীপ কোনো কথা বলে না কিন্তু সময় ঠিকই এগিয়ে চলে। আপার ইণ্ডিয়া-দিল্লী এক্সপ্রেস যাবার পর মাইকে দিল্লী জনতার এ্যানাউন্সমেণ্ট হতেই সুদীপ বলল, এব পরই আমাদের ট্রেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

মালপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াবার পর মালা জিজ্ঞেস করল, আমরা কূপে পাবো তো?

ভদ্রলোক তো কথা দিয়েছেন।

মা কালী যদি দয়া করে কূপেটা পাইয়ে দেন, তাহলে বাঁচি।

সুদীপ একটা সিগারেট ধরায় কিন্তু শেষ করার আগেই মাইকে ঘোষণা হয়—নাইন আপ ডেরাডুন এক্সপ্রেস ইজ সর্টলি এ্যারাইভিং এ্যাট....

জানো সুদীপদা, এ্যানাউন্সমেণ্টটা শুনেই বুকের মধ্যে....

সুদীপ একটু হেসে ওর কানে কানে বলে, আর সুদীপদা বলে ডেকো না।

মালা জিভ কেটে বলল, কেউ শুনলেই কেলেঙ্কারী হয়েছিল!

চোখের পাতা পড়তে না পড়তেই ডুন-এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। সুদীপ সুটকেশ-বেডিং হাতে নিয়ে একটু এগুতেই কণ্ডাক্টর গার্ড উল্টো দিক থেকে চার্ট হাতে করে হাজির—কোন ক্লাশে রিজার্ভেশন?

ফার্স্ট ক্লাশ!

মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস সরকার?

হ্যাঁ।

ওয়ান সিক্স টু ওয়ান'এর কম্পার্টমেণ্ট ই!

দুটো বগীর পরই ওদের বগী। গাড়িতে উঠতেই কোচ এ্যাটেন-ড্যাণ্ট বলল, 'ই'।

'ই' কম্পার্টমেণ্টে ঢুকেই ওরা দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসে। না হেসে পারে না। সুদীপ দরজাটা বন্ধ করতেই মালা ওকে পাগলের মত জড়িয়ে ধরে। সুদীপও ওকে দু'হাত জড়িয়ে ধরে।

'সে এক অবিস্মরণীয় রাত্রি! পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে বোধহয় একজনের জীবনেও এমন আনন্দঘন পরম তৃপ্তিভরা রাত্রি আসে না।' বর্ধমান স্টেশনের ওয়েটিং রুমে প্রত্যেকটা মিনিটকে এক একটা ঘণ্টা মনে হচ্ছিল আর ডুন এক্সপ্রেসের এই কূপেতে ঢোকার পর এক একটা ঘণ্টা এক এক মিনিটে উড়তে শুরু করল। দুর্গাপুর-রানীগঞ্জ-আসানসোল তো দূরের কথা, কখন যে নাইন আপ ডুন এক্সপ্রেস ধানবাদও পার হল, তা ওরা টের পেল না। হুঁস হবার পর

সুদীপ প্রথম ঘড়ি দেখেই অবাক, জানো, ক'টা বাজে ?

ক'টা ?

তিনটে পাঁচ।

এরই মধ্যে তিনটে বেজে গেল ?

আমি ভেবেছিলাম, বড় জোর একটা বাজে।....

আমিও তাই ভেবেছিলাম।

বর্ধমান থেকে ট্রেনে ওঠার আগেই মনে মনে ঠিক করেছিলাম, দেড়টা নাগাদ আসানসোল পৌঁছলে চা খাবো। সুদীপ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, আসানসোল তো দূরের কথা, ধানবাদও চলে গেছে।

মালা হাসতে হাসতে বলে, সতরঞ্চি-চাদরটা পর্যন্ত পাতা হয়নি।

ট্রেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি যা শুরু করলে....। সুদীপ চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলে।

তা তো বটেই! আর তুমি সাধু, তাই না ?

সারা বোসপাড়ার লোক জানে, আমি সাধু।

কিন্তু সেই সাধুর আমি যে রূপ দেখলাম, তা আর....

দু'জনেই এক সঙ্গে হেসে ওঠে। হাসি থামতে না থামতেই ট্রেন গোমোয় আসে।

এবার ওরা সত্যি সতরঞ্চি-চাদর বিছিয়ে নেয়। একটা বালিশেই দু'জনে মাথা দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। কত হাসি, কত আনন্দ, কত খেলা হয় সারা রাত্তির। তাছাড়া কত কথা।

তোমাকে আমি দীপ বলে ডাকব, কেমন ? মালা বলে।

আমি তো তোমারই। তুমি আমাকে যা ইচ্ছে বলে ডাকতে পার।

তুমি আমাকে কি বলে ডাকবে ?

সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, বেগম।

মালা সঙ্গে সঙ্গে ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, ভেরি গুড!

আরো কত কথা হয়।

মালা বলে, জানো দীপ, আমি এই প্রথম ফার্স্ট ক্লাশে চড়ছি। তুমি ?

আমিও।

বাবার সঙ্গে যে দু'তিনবার বেড়াতে গেছি, সবসময় সেকেণ্ড ক্লাশে গেছি। সেকেণ্ড ক্লাশে গিয়ে কোনো আনন্দ নেই, তাই না?

সুদীপ হেসে বলে, ফার্স্ট ক্লাশের মত আরাম বা আনন্দ কি সেকেণ্ড ক্লাশে সম্ভব?

একটু চুপ করে থাকার পর মালা বলে, আজ যদি আমাদের সেকেণ্ড ক্লাশে যেতে হতো, তাহলে সব আনন্দ মাটি হয়ে যেত।

আজ তোমার যে রূপ দেখলাম, তাতে বেশ বুঝতে পারছি, তোমাকে নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাশে যাওয়া খুব রিস্কি।

মালা ওর চুলের মুঠি ধরে বলল, আমার যে রূপ দেখলে, তাই না? আর তোমার মত গুডবয়ের কি রূপ, তাও তো দেখলাম!

সুদীপ শুধু হাসে।

তারপর আবার ঝড় ওঠে। তারপর মালা বলে, আমরা সবসময় ফার্স্ট ক্লাশ কূপেতে ট্রাভেল করব, কেমন?

তোমার স্বামী কি মালকড়ি আয় করবে....

তুমি ভালই আয় করবে। মালা একটু থেমে বলে, ঐ বোসপাড়ার গলিতে যে জীবন কাটিয়েছি, সেরকম ভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানেই হয় না। ভালভাবে বাঁচব বলেই তো তোমাকে বিয়ে করলাম।

হঠাৎ সুদীপ প্রশ্ন করল, আচ্ছা দত্তদা'র স্ত্রী উকিলবাবুর বাড়িতে ফোন করলে ওরা কেউ ধরতে পারবে না তো যে তোমার নাম করে অন্য কেউ....

না, না, কিছু ধরতে পারবে না। আমি কি রোজ ওদের বাড়ি ফোন করি যে ওরা আমার গলা চিনবে?

তা ঠিক।

আমি জীবনে কোনোদিন উকিলবাবুর বাড়িতে ফোন করি নি।

তাহলে কখনই ধরতে পারবে না।

দত্তদা'র স্ত্রী ফোন করেছেন তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। সুদীপ একটু থেমে বলে, দত্তদা আর বৌদি আমাদের

জন্য এত করলেন আর সামান্য একটা টেলিফোন করবেন না ?

তা ঠিক। ওরা দু'জনে আমাদের জন্য যা করলেন, তা আমি সারা জীবনেও ভুলতে পারব না।

সুদীপ তো দূরের কথা, এ সংসারে চরম উপেক্ষিত ঘৃণিত মানুষকেও কেউ না কেউ ভালবাসবেই। শুধু তাই নয়। মানুষ যে কখন কোথায় কার কাছে এই ভালবাসা পাবে, তারও ঠিক নেই। কি আশ্চর্যভাবে এই দত্ত দম্পতির সঙ্গে সুদীপের ভাব-ভালবাসা হয়ে গেল !

হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবার পর সুদীপ বাবা-মাকে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে বেড়াতে যাবার অনুমতি পেল। প্রথমে ভেবেছিল, দিল্লী-আগ্রা-জয়পুর যাবে কিন্তু মা বললেন, না-রে, তোর বাবা অত দূর বেড়াতে যাবার টাকাকড়ি দিতে পারবে না। তুই বরং কাছাকাছি কোথাও যা। শেষপর্যন্ত অনেক আলাপ-আলোচনা হিসেব-নিকেশ করে ঠিক হলো কাশী যাবার। যদি সম্ভব হয়, তাহলে দু' একদিনের জন্য এলাহাবাদও ঘুরে আসবে।

তারপর একদিন সুদীপ্রী আপ বোম্বে মেল-এ উঠল কাশী পথে মোগলসরাই যাবার জন্য। এর আগে ও কখনও একা বাইরে যায় নি। তাই সে কি আনন্দ আর উত্তেজনা। রাত বারোটার সময় আসানসোল ছাড়ার পর ঘুমুতে গেলেও মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে গেল। তারপর সত্যি সত্যিই যখন উঠে পড়ল, তখন বোম্বে মেল ডেরি-অন-সোন স্টেশনে দাঁড়িয়ে। তখন বোধহয় সাড়ে পাঁচটা বাজে।

সাড়ে সাতটা নাগাদ মোগলসরাইতে নেমে বাস ধরে সুদীপ যখন কাশী পৌছল, তখন সাড়ে ন'টা বাজে। তারপর কোম্পানী বাগ বাস স্ট্যাণ্ড থেকে গোধুলিয়ার মোড়ের হরসুন্দরী ধর্মশালা। কালোদা অবশ্য বলেছিলেন, সোজা পাঁড়ের ধর্মশালায় চলে যাবি। যেমন বড়, তেমনি সুন্দর বিধিব্যবস্থা কিন্তু বুড়ো রিক্সাওয়ালা বলল, খোকাবাবু, পাঁড়ের ধর্মশালা থেকে বিশ্বনাথজী কা মন্দির বা গঙ্গা বেশ দূর। তাই তুমি গোধুলিয়ার মোড়ে হরসুন্দরী ধর্মশালায় চলো।

ওখানে জায়গা পাবো তো ?

ওখানে পুরো একটা কামরা তোমাকে দিয়ে দেবে। বুড়ো রিক্সাওয়ালা একটু থেমে বলে, আগে তো সব বড় বড় বাংগালী বাবুরা হরসুন্দরী ধর্মশালাতেই থাকতেন কিন্তু এখন বাড়িটা পুরানা হয়ে গেছে বলে ওখানে কম বাবু যায়।

ওখানে তো খাওয়া-দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই না ?

আপনি কোনো ধর্মশালায় খাবার পাবেন না। তবে আপনার অসুবিধা হবে না। আশপাশ বহুত দোকান আছে।

কিছুক্ষণ পর ঐ বুড়ো রিক্সাওয়ালাই বলল, হরসুন্দরীর সামনেই স্ট্যাণ্ড। দরকার হলে আমি আপনাকে সব দেখিয়ে দেব।

তাহলে তো খুব ভাল হয়।

হরসুন্দরীর ধর্মশালাটি সত্যি পুরনো, তবে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঐ বুড়োর সুপারিশে সুদীপ একটা পুরো ঘরই পেয়ে গেল। বেশী লোকজনেরও ভীড় নেই। তাছাড়া আশেপাশে দোকান-বাজার গিজ গিজ করছে। গঙ্গা আর বিশ্বনাথের মন্দিরও খুব কাছে। সব মিলিয়ে সুদীপ খুশিই হলো।

সুদীপ সকাল-বিকেল ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যের পর কোনোদিন রাণাঘাট বা দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে থাকে দু'এক ঘণ্টা। তারপর ধর্মশালায় ফেরার পথে খেয়ে নেয়। দুপুরে মাকে চিঠি লেখার পরই ডায়েরী লিখতে বসে।

মা, দিল্লী-আগ্রা জয়পুরের বদলে তোমরা আমাকে কাশী পাঠিয়ে ভালই করেছ। আমি সত্যি ভাবতে পারি নি, কাশী আমার এত ভাল লাগবে। আমার মনে হয় পৃথিবীতে আর এমন সহর নেই। ইংরেজরা সারা দুনিয়ার মানুষকে জানিয়েছে, ব্যাবিলনই পৃথিবীর প্রাচীনতম সহর, কিন্তু ওরা বলতে ভুলে গেছে, কাশীও ব্যাবিলনেরই সমসাময়িক। যে রামায়ণ-মহাভারত চার-পাঁচ হাজার বছর আগে লেখা, তাতেও কাশীর কথা আছে। ভাবলেও গর্বে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, তাই না মা ? দশাশ্বমেধ ঘাটে একজন প্রবীণ কাশীবাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে

আলাপ হলো। তিনি বললেন, পুরাণে লেখা আছে, সুহোত্র'র ছেলে কাশ্য এই সহর তৈরি করেন বলেই এর নাম কাশী। তার রাজ্যের নামও ছিল কাশী।.....

আসতে পারি?

কথাটা শুনেই চিঠি লেখা বন্ধ করে সুদীপ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, দরজার ঠিক ওপাশে এক দম্পতি। বয়স কত হবে? বড় জোর তিরিশ। তার বেশি কখনই না। ওরাও এই হরসুন্দরীর ধর্মশালাতেই আছেন। সুদীপ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আসুন, আসুন।

ওরা দুজন ঘরে ঢুকতেই সুদীপ চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলে, একজন চেয়ারে বসুন, আরেকজন বিছানাতেই বসুন।

ভদ্রমহিলা চেয়ারে বসলেও ভদ্রলোক বসার আগেই বললেন, আমার নাম সরিৎ দত্ত, আর ইনি আমার স্ত্রী মাধুবী।

ঠিক এইভাবে কোনো ভদ্রলোক কোনোদিন ওর সঙ্গে আলাপ করেন নি বলে সুদীপ একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েই বলে, ও আচ্ছা!

তোমার নাম কি?

সুদীপ্ত সরকার।

মাধুবী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় থাকো?

কলকাতায়, বাগবাজারে।

সরিৎবাবু বললেন, আমরা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে মীর্জাপুরে থাকি।

ও!

তুমি একাই এসেছ?

হ্যাঁ, একাই এসেছি। ওদের কথাবার্তায় একটু আন্তরিকতার ভাব অনুভব করেই সুদীপ বলে, হায়ার-সেকেণ্ডারী পরীক্ষা হয়ে গেল বলেই বাবা-মাকে বলেছিলাম, দিল্লী-আগ্রা-জয়পুর যাব কিন্তু শেষপর্যন্ত ওখানে না গিয়ে কাশী চলে এলাম।

এর আগে কাশী এসেছ?

না।

মাধুরী একটু হেসে বলেন, তুমি বোধহয় এই প্রথম একা বেড়াতে

বেরিয়েছ ?

সুদীপও একটু হেসে জবাব দেয়, হ্যাঁ।

খুব মজা লাগছে তো ?

হ্যাঁ।

সারা দুপুর তুমি কি এত লেখালেখি করো ?

সুদীপ একটু লজ্জিত, একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলে, আমি একা এসেছি বলে মা'র তো খুব দুশ্চিন্তা! তাই রোজ মাকে একটা চিঠি লিখি।

সারা দুপুর ধরেই শুধু মাকে চিঠি লেখো ?

না, ডায়েরীও লিখি।

সরিৎবাবু বললেন, ভেরি গুড হ্যাবিট।

মাধুরী প্রশ্ন করেন, তুমি কি রেগুলার ডায়েরী লেখো ?

হ্যাঁ, রোজই কিছু না কিছু লিখি।

বা! খুব ভালো।

সেই শুরু।

পরদিন সকালে সরিৎবাবু এসে বলল, সুদীপ, তোমার বৌদি তোমাকে ডাকছেন।

সুদীপ ওদের ঘরে যেতেই মাধুরী ওর হাতে এক প্লেট খাবার দিয়ে বললেন, নাও।

একি আপনি····

সরিৎবাবুর সোজা কথা, তোমার বৌদি যখন দিচ্ছেন, তখন খেয়ে নাও।

মাধুরী বললেন, আমরাও তো খাচ্ছি।

হ্যাঁ কিন্তু····

নাও, নাও, খাও। বৌদির কথার অবাধ্য হতে নেই।

কথাটা শুনেই সুদীপের সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে আনন্দের বিদ্যুৎ বয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য মনে হল, এমন আপনজন যেন তপস্যা করেও পাওয়া যায় না! এই সংসারে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী থাকলে যেমন আকাশ ভরা সূর্য তারা দেখা যায় না, তেমনি খুঁজে

পাওয়া যায় না পরমপ্রিয় আপনজন। মনের মানুষ।) খাবার প্লেট হাতে নিয়ে সুদীপ মন্ত্রমুগ্ধের মত ওর নতুন বৌদির দিকে তাকিয়ে থাকে।

কি হল? খাও!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাচ্ছি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর সরিৎবাবু বললেন, এই এতবড় ধর্মশালার দোতলায় তো শুধু আমরা তিনজনেই আছি। সুতরাং এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হয়? আমরা তিনজনেই একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করব।

না, না, আমার জন্য আপনারা····

মাধুরী বললেন, তুমি বড্ড লাজুক, তাই না?

না, লাজুক না তবে····

তবে আর এত দ্বিধা কিসের? তোমার কি একলা একলা খেতে খুব ভাল লাগে?

না, না, তা না।

সরিৎবাবু বললেন, ওরে বাপু, আমরা দুজনেই চাকরি করি। তোমার মত এক ভাইকে খাওয়ালে আমরা না খেয়ে মরব না।

এই কথার পর কি আর কিছু বলা যায়? সেইদিন সেই মুহূর্ত থেকে ওরা ওর দাদা-বৌদি হয়ে গেলেন।

সারাদিনে দুজনের কম পরিশ্রম হয়নি। সেই দুপুরবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা ঘুরে-ফিরে হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে বর্ধমান। বর্ধমানেও যথেষ্ট ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। তারপর ঐ কয়েক ঘণ্টা স্টেশনে বসে থাকা কি কম ক্লান্তিকর! এর ওপর ছিল উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনা। ডুন এক্সপ্রেসে ওঠার পর পরই শুরু হয়েছে মাতলামী-পাগলামী। আনন্দে উত্তেজনায় দুজনেই ভেসে গেছে। গোমো ছাড়ার পরই সুদীপ বলেছিল, বেগম, ঘুমুবে না?

আজ তুমি আমাকে ঘুমুতে বলবে না। আজ আমি যা খুশি করব, তাতেও তুমি বাধা দেবে না।

না, সুদীপ বাধা দেয়নি। দিতে পারেনি। ইচ্ছে করেনি। 'এ জীবনে যে মাঝে মাঝে বেহিসেবী আনন্দ বড় ভাল লাগে।

তবে পাঁচটা নাগাদ কোডারামা আসতে না আসতেই মালা ঘুমিয়ে পড়েছে। না, আর জেগে থাকতে পারেনি। শত অবসাদ ক্লান্তি সত্ত্বেও সুদীপের চোখে ঘুম এলো না। ঘুরে-ফিরে বার বার শুধু দাদা-বৌদির কথাই মনে পড়ল। দাদা-বৌদির জন্য সেবার কাশীর দিনগুলো কি আনন্দেই কেটেছিল! সেই ভোরবেলায় বৌদির ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙার পর চা খাওয়া। ঐ চা বার বার খেতে খেতেই কত গল্প! তারপর বৌদি এক সময় বকুনি দিতেন, আচ্ছা তোমরা কি সারাদিন শুধু চা খেয়েই কাটাবে? জলখাবার-টাবার খেতে হবে না?

এইতো যাচ্ছি। দেখছ না কি সিরিয়াস বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। দাদা গম্ভীর হয়েই জবাব দিতেন।

হা ভগবান! এই তোমাদের সিরিয়াস আলোচনা?

এইভাবেই দিন শুরু হতো। খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজবে সারাদিন কোথা দিয়ে যে কেটে যেত, তা টের পাওয়া যেতো না। তারপর সূর্য ঢলে পড়লে ত্রিলোচনের নৌকায় চড়ে প্রতিদিন দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে অসি ঘাট, অসি ঘাট থেকে রাজঘাট ঘুরে আবার দশাশ্বমেধ ঘাটে ফিরে আসা। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আবার শুরু হতো গল্পগুজব কিন্তু দাদা বেশি রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকতে পারেন না। সুদীপ আর বৌদির গল্প চলতো অনেক রাত পর্যন্ত।

সুদীপ, মিষ্টি খাবে?

সুদীপ হাতের ঘড়িটা দেখে একটু হেসে বলে, এই রাত সাড়ে বারোটার সময় মিষ্টি?

তাতে কি হল? এখনও জলযোগে গেলে খদ্দেরের ভীড়

দেখতে পাবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বৌদি বলেন, কাশীর মত ভাল মিষ্টি কলকাতায় পাবে না, বুঝলে ?

তা ঠিক।

এইসব ছাড়াও সুদীপের আরও একটা কাজ ছিল। মার চিঠিটা ডাকবাক্সে দেবার আগে ও রোজ বৌদিকে পড়ে শোনাত, জানো মা, রোজ বিকেলে যখন গঙ্গায় নৌকা চড়ে ঘুরে বেড়াই, তখন আমার চোখের সামনে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস ভেসে ওঠে।....

সব চাইতে উত্তরে অসি ঘাট। এর কাছেই দুর্গাবাড়ি! আর ঠিক উল্টোদিকে কাশীরাজের রামনগর প্রাসাদ। এই প্রাসাদের মিউজিয়ামে তুলসীদাসের নিজের হাতে লেখা রামায়ণ আছে। অসি ঘাট নাম কেন জানো? শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের সময় দুর্গার অসি-তরোয়াল, এখানে পড়েছিল বলেই এর নাম অসি ঘাট। এখানকার তুলসীঘাটে বসেই তুলসীদাস তার বিখ্যাত রামচরিতমানস রচনা করেন। রাজা চৈৎ সিং থাকতেন শিবালা ঘাটের ওপরের দুর্গে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের নামেই হরিশ্চন্দ্র ঘাট। রাজা মান সিং তৈরি করেন মানসরোবর ঘাট। জয়সিংহের মানমন্দির আছে মানমন্দির ঘাটে। উদয়পুরের রাণাই তৈরি করেন রাণাঘাট। দশাশ্বমেধ ঘাটে যে স্বয়ং ব্রহ্মা দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, তা তো আর বলে দিতে হবে না।....

বৌদি হঠাৎ বলেন, তোমার চিঠিগুলো ভারী সুন্দর হয়।

সুদীপ হাসে।

হাসছ কি ? ক'জন ভাল চিঠি লিখতে পারে ? বৌদি ওর দিকে তাকিয়ে বলেন, এর পর তুমি যেখানে যাবে, সেখান থেকে আমাকেও চিঠি লিখতে হবে।

আরও কত কথা মনে পড়ে সুদীপের। মালা ঘুমের মধ্যেও ওকে জড়িয়ে আছে। নাইট ল্যাম্পের আলোয় সুদীপ একবার দেখে। তারপর মনে মনেই বলে, দাদা-বৌদি, শুধু তোমাদের জন্যই

আমরা এই আনন্দের মহাসাগরে ভেসে চলেছি। তোমাদের ঋণ কি কোনোদিন শোধ করতে পারব ?

॥ তিন ॥

তিনদিনের লক্ষ্ণৌ বাস সত্যি মধুময় হল। সেই সাতসকালে ওরা চারবাগের হোটেল থেকে বেরিয়ে সারাদিন মনসুরউদ্দীন মিয়ার টাঙায় চড়ে ঘুরে বেড়াত। রুমি দরওয়াজা, খুর্শীদ মঞ্জিল, কাইজার বাগ, শাহ নাজফ্, কদম রসুল, রেসিডেন্সী। আরও কত কি! বড় ইমামবড়ার স্তম্ভহীন বিরাট হলঘরটি দেখিয়ে সুদীপ মালাকে বলে, আসফউদ্দৌলার এঞ্জিনিয়াররা কী করে কোনো পিলার ছাড়াই এই পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে ছাদ তৈরি করলেন, তা আজকের এঞ্জিনিয়াররা বুঝতে পারেন না।

মালা ছাদ দেখতে দেখতে বলে, সত্যিই তো অবাক কাণ্ড!

পিলারহীন এতবড় হলঘর পৃথিবীতে আর নেই বলেই শোনা যায়।

আচ্ছা!

ঐ হলঘরের দোতলার ভুলভুলিয়ায় ওরা লুকোচুরি খেলে। তারপর হঠাৎ দেখা হলে সে কি হাসি!

কতকালের কত ইতিহাসের সাক্ষী এই লক্ষ্ণৌ শহরে ঘুরতে ঘুরতে সুদীপ বলে যায়, কিছু কিছু ঐতিহাসিক বলেন, লক্ষ্মণ এই শহরের প্রতিষ্ঠা করেন বলেই এর নাম লক্ষ্ণৌ। অনেক বেশি ঐতিহাসিকের ধারণা, লখ্না নামে এক হিন্দু এঞ্জিনিয়ার এই শহর তৈরি করেন বলেই নাম হয়েছে লক্ষ্ণৌ।

মালা কোনো প্রশ্ন করে না। মুগ্ধ হয়ে ওর কথা শোনে।

সুদীপ আপন মনে একটু হেসে বলে, কোথাকার পারস্যের এক অজানা ব্যবসাদার সাদান খান এ-দেশে এসেই হয়ে গেলেন অযোধ্যার নবাব। সাদান খানের রাজধানী হল এই লক্ষ্ণৌ। ওর ছেলে সফদার জং রাজধানী করলেন দিল্লী আর তার ছেলে রাজত্ব চালাতো

ফৈজাবাদ থেকে।....

মালা হেসে বলে, নবাবদের ব্যাপারই আলাদা!

তবে লক্ষ্ণৌ-এর মানুষ কোনদিন ভুলবে না সুজার ছেলে আসফউদ্দৌলাকে। যা কিছু নিয়ে এই শহরের গর্ব, তার বারো আনাই ওর তৈরি।

তাই নাকি?

দৌলতখানা, বড় ইমামবড়া, মসজিদ, রুমি দরওয়াজা, খুর্শীদ মঞ্জিল, আয়েসবাগ বা আমাদের হোটেল যেখানে সেই চারবাগও তো ওরই তৈরি। সুদীপ প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলে, এসব কিছুর চাইতে বড় কথা, ওর মত পরোপকারী নবাব ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুর্লভ। তাইতো এখনও লোকের মুখে শোনা যায়—জিস কো খুদা নেই দেতা, উসকো আসফউদ্দৌলা দেতা হ্যায়।

তার মানে?

তার মানে, যাকে ভগবানও ফিরিয়ে দিতেন, কিছু দিতেন না, তাকেও আসফউদ্দৌলা খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না।

মালা ওর কাঁধের উপর মাথা রেখে দু'হাতের মধ্যে একটা হাত নিয়ে খেলা করতে করতে বলে, সব জায়গার ইতিহাসই তোমার মুখস্থ, তাই না?

সব জায়গার ইতিহাস জানা কি সহজ ব্যাপার? তবে সেই ছোটবেলা থেকে মার কাছে এইসব জায়গার গল্প এত শুনেছি যে....

সত্যি! মাসীমা যেন ইতিহাস গুলে খেয়েছেন। মালা একটু থেমে বলে, আমাদের পাড়ায় বোধহয় এমন কোন ছেলেমেয়ে নেই, যার ইতিহাসের বই মাসীমা পড়েননি।

সুদীপ একটু হেসে বলে, মা তো হরদম স্কুল-কলেজের বই আর খবরের কাগজে সন-তারিখ বা নামের ভুল বের করেন।

সারাদিন ঘোরাঘুরির পর সন্ধ্যেবেলায় হোটেলের সামনে টাঙ্গা থামতেই মনসুরউদ্দীন জিজ্ঞেস করে, সাব, হাত-মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করার পর হজরতগঞ্জে চাট খেতে যাবেন কী?

সুদীপ হেসে বলে, আরে মিয়া, লক্ষ্ণৌ এসে চাট খেতে যাব না ?

মনসুরউদ্দীনও হেসে বলে, হা সাব, আমিও তাই ভাবছিলাম।

আলোয় ঝলমল হজরতগঞ্জে শর্মাজীর দোকানের সামনে মনসুর মিয়ার টাঙ্গায় বসে বসে চাট খেতে খেতেই মালা বলে, কলকাতায় আধ ঘণ্টা-এক ঘণ্টা তোমার সঙ্গে একটু গল্প করার জন্য কত কি করতে হত! তোমাকে একটু ভাল করে কাছে পাবার জন্য কী ইচ্ছেই করত!

সুদীপ মজা কবার জন্য বলে, সত্যি নাকি ?

আমি কী তোমার মত ? মালা একটু অভিমান কবে বলে, আগে তো তুমি আমাকে পাত্তাই দাওনি!

ভয় পেতাম।

কিসের ভয় ? আমাকে বিয়ে করার ভয় ?

না, না, তা না।

তবে ?

চাকরি-বাকরি না পেয়ে বেশিদূব এগুতে ভয় হত।

মালা হেসে বলে, আর এখন ?

তুমি এমন অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা কবে বসলে যে···

এখন ভয় করছে না ?

এখন আর ভয় করে লাভ কী ? সুদীপ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এখন যেভাবেই হোক এগিয়ে যেতে হবে।

হোটেলে ফিবেও কত গল্প, কত খেলা! তারপর একবার মালা ওর কানে কানে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে, আমাকে কেমন লাগছে ?

মনে হচ্ছে টাটা স্টীলের শেয়ার কিনেছি। সারা জীবনেও এর দাম কমবে না।

মালা শুধু হাসে।

তিন দিনের লক্ষ্ণৌ বাসের মেয়াদ ফুরিয়ে আসে। নৈনিতাল এক্সপ্রেস ধরার জন্য মনসুরউদ্দীনের টাঙ্গায় চড়ে স্টেশন পৌঁছে সুদীপ

বলে, খোদার কাছে একটু দোয়া কর, আমরা যেন সুখী হই। বৃদ্ধ মনসুরউদ্দীন মিয়া সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত উপরে তুলে বলে, সাব, খোদা মেহেরবান। তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের ভাল করবেন।

ন'টা বাজতে না বাজতেই নৈনিতাল এক্সপ্রেস কাঠগোদাম পৌঁছল। সেখান থেকে নৈনিতাল মাত্র ঘণ্টা খানেকের রাস্তা। ইণ্ডিয়া হোটেলে ঘর পেতে একটুও অসুবিধে হল না। তাছাড়া ঘরটিও বেশ ভাল।

জিনিসপত্র ঠিকঠাক করে চা খেতে খেতেই সুদীপ প্রশ্ন করল, বেগম, নৈনিতালের মানে জান?

কোন জায়গার নামের আবার মানে কী?

তাল মানে লেক, জলাশয়, তা জানো?

তাই বুঝি?

হ্যাঁ।

এখানকার এই লেকের পাড়ে নয়নীদেবীর মন্দির আছে বলেই····

ও!

নয়নীই নৈনি হয়েছে আর···

আর বলতে হবে না।

কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে দাদা-বৌদি দু'জনেই বলেছিলেন, সুদীপ, অন্তত দিন দশ-বারো নৈনিতালে থেকো।····

অত দিন?

বৌদি বলেছিলেন, হ্যাঁ। এই মন আর এই সময় সারা জীবনেও আর ফিরে আসবে না। তাছাড়া দু'জনে দু'জনের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলবে। এই সময় কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে মেলামেশা করলে সারাজীবনই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি থেকে যায়।

তাই তো দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম নেবার সময়ই সুদীপ বলল, বেগম, দাদা-বৌদি কি বলেছেন, তা মনে আছে তো?

হ্যাঁ। মালা একটু থেমে বলে, তুমিও আমাকে নতুন দেখছ না, আমিও তোমাকে নতুন দেখছি না। তুমিও আমাকে ভালভাবে জানো, আমিও তোমাকে ভালভাবেই জানি। আমাদের মধ্যে ভুল

বোঝাবুঝি হতেই পারে না।

তা ঠিক কিন্তু তুমি আমাকে স্বামী হিসেবে তো কোনদিন কাছে পাওনি, আমিও····

মালা ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি কিছু চিন্তা করো না। আমরা ঠিকই সবকিছু মানিয়ে নেব।

সুদীপ কী বলবে? চুপ করে থাকে কিন্তু মনে মনে বলে, এখন না হয় দাদা-বৌদির পয়সায় স্ফূর্তি করছি। কলকাতায় ফিরেও ওদের বাসাতেই উঠব। দাদা অবশ্য বলেছেন, যা হোক একটা চাকরি ঠিকই জোগাড় হয়ে যাবে কিন্তু··

হাসি ঠাট্টা গল্পগুজব আনন্দ উপভোগের পরম মুহূর্তেও সুদীপের মন কখনও কখনও খচ খচ করে। তল্লিতাল-মল্লিতালের পাড় দিয়ে ঘোরাঘুরি করার সময়ও মাঝে মাঝে ঐ কিন্তুর চিন্তায় আনমনা হয়ে যায়। তবু দিনগুলো বেশ কাটে।

বেগম, এই নৈনিতালের আশেপাশেই আরো অনেক ভাল ভাল জায়গা আছে। তুমি কি দু'একটা জায়গায় যেতে চাও?

না, না, আমি আর কোথাও যাচ্ছি না। এখানেই বেশ আছি। মালা একটু থেমে বলে, কতদিন ধরে স্বপ্ন দেখছি তোমাকে একটু প্রাণ ভরে কাছে পাবার জন্য। আমাকে আর কোথাও যেতে বলবে না।

সুদীপ ওর কথা শুনে হাসে।

কলকাতায় ফিরে যাবার পর আবার কবে তোমাকে এভাবে পাবো, তার কি ঠিক আছে?

দিনগুলো বেশ কেটে যায়! দেখতে দেখতে একটা সপ্তাহ হয়ে গেল।

সেদিন সকালে ব্রেকফাস্টের সময়ই ওরা হঠাৎ ঠিক করল, খুরপা তাল যাবে। বেশি দূর নয়। মাত্র মাইল তিনেক রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতেই যাবে। আবার দুপুরের আগেই ফিরে আসবে। চা খেতে খেতেই ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। হঠাৎ এক মধ্যবয়সী বাঙালী ভদ্রমহিলা ওদের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে একটু হেসে

বললেন, ক'দিন ধরেই ভাবছিলাম আপনাদের সঙ্গে আলাপ করব কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি।

মালা পাশের একটা খালি চেয়ার একটু এগিয়ে দিয়ে বলে, আপনি বসুন।

বসব? আপনাদের বিরক্ত করা হবে না তো?

সুদীপ বলল, আপনি নিজে থেকে আলাপ করতে এসেছেন আর বিরক্ত হবো?

ভদ্রমহিলা চেয়ারে বসেই বলেন, অনেককাল বাইরে ছিলাম বলে বাঙালী দেখলেই আলাপ করাব লোভ ছাড়তে পাবি না।

মালা জিজ্ঞেস করে, আপনারা কোথায় থাকেন?

বছর দুয়েক হল কলকাতাব কাছে কল্যাণীতে থাকি। তবে তার আগে বাইশ বছর ব্রিটেনে ছিলাম।

ও!

সুদীপ এবার হাতজোড় করে নমস্কার করে বলে, আমার নাম সুদীপ্ত সরকার। তবে সবাই আমাকে সুদীপ বলে আর ও আমার স্ত্রী মালা।

আপনাদের বোধহয় বেশিদিন বিয়ে হয়নি, তাই না?

মালা লজ্জায় মুখ নীচু করে। সুদীপ একটু সলজ্জ হাসি হেসে বলে, বিয়ের পব পরই আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি।

সো ইউ আর অন হনিমুন ট্রিপ?

ওবা দুজনেই লজ্জায় মুখ নীচু করে।

ওয়েটার আসতেই মালা তিনটে কফির অর্ডার দেয়। এবার ভদ্রমহিলা একটু হেসে বলেন, আপনাদের সঙ্গে গল্প করার নেশায় আমার পরিচয় দিতেই ভুলে গেছি।...

ওরা হাসে।

আমার নাম বিদিশা ব্যানার্জী আর আমার স্বামী হচ্ছেন শ্যামল ব্যানার্জী।

সুদীপ্ত বলে, আপনার নামটা ভারী সুন্দর।

আমার বাবা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেতে কাজ করতেন। তাই আমাদের সব ভাইবোনের নামই ঐরকম। এবার উনি মালার দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমার নামটাও খুব সুন্দর।

আর আমার নামটা? সুদীপ হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

আপনার নামটিও বেশ ভাল।

এরই মধ্যে মিঃ ব্যানার্জী পাইপের টোবাকো কিনে ফিরে এসে ওদের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে বলেন, তুমি এরই মধ্যে আড্ডা জমিয়েছ?

সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে খালি চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলে, আপনি বসুন।

বসব? আপনারা কোথাও বেরুবেন না?

না, না, আপনি বসুন। আমাদের তেমন কোনো বেরুবার তাগিদ নেই।

মিসেস ব্যানার্জী হাসতে হাসতে স্বামীকে বলেন, ওরা হনিমুনে এসেছে।

মিঃ ব্যানার্জী বললেন, অল দ্য বেস্ট ফর ইওর ম্যারেড লাইফ!

ধন্যবাদ!

মিসেস ব্যানার্জী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন, নিউলি ম্যারেড কাপল্‌কে অমন শুকনো শুভেচ্ছা জানাবার কোনো মানে হয় না। হয় ওদের একদিন ভাল করে খাওয়াও, নয়তো কিছু প্রেজেন্টেশন দাও।

সুদীপ আর মালা প্রায় একই সঙ্গে বলে, না, না, তার দরকার নেই।

মিঃ ব্যানার্জী বললেন, ও. কে! আজ রাত্তিরেই ওদের অনারে ডিনার হোক।

সুদীপ আর মালা দুজনেই বার বার বলল, ওসব কিছুর দরকার নেই। কিন্তু মিঃ ব্যানার্জী বললেন, এসেছি বেড়াতে। চারজনে একসঙ্গে খাব, আর তো কিছু না। এতে এত আপত্তির কি আছে?

ডাইনিং-রুম ছেড়ে এবার দোতলার বারান্দায় বসে ওদের আড্ডা হয়। এ-কথা সে-কথার পর সুদীপ জিজ্ঞেস করে, ব্রিটেন থেকে চলে এলেন কেন?

আমাদের তো একটা মাত্র মেয়ে। তাব বিয়ে দিয়েছি কলকাতারই একটি ছেলের সঙ্গে। তাছাড়া ওদেশে যাবার আগেই কল্যাণীতে একটুকবো জমি কেনা ছিল। তাই চলে এলাম।

মালা মিসেস ব্যানার্জীকে জিজ্ঞেস করে, আপনার জামাই কী করেন?

আমাব জামাইও ওবই মত এঞ্জিনিয়াব।...

তাই নাকি?

মিসেস ব্যানার্জী বলে যান, কানপুব আই-আই-টি থেকে পাশ করাব পব ও আমেরিকায় গিয়ে পোস্ট-গ্রাজুয়েট হয়। এবার উনি একটু হেসে বলেন, আমবা তিনজনে আমেরিকায় বেড়াতে গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ হয়।

আচ্ছা!

সুদীপ মিঃ ব্যানার্জীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আপনি এখন কিছু করছেন না?

মিঃ ব্যানার্জী প্রাণখোলা একটু হাসি হেসে বলেন, এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলেও আসলে আমবা মিস্ত্রী। তাই কাজ না করে আমবা থাকতে পাবি না। উনি একটু থেমে বলেন, আমি আর আমার জামাই মিলে একটা ছোট্ট কাবখানা করেছি।

বাঃ! খুব ভাল।

হ্যাঁ, বেশ ভালই লাগছে। লাকীলি কাজের ছেলেগুলোও ভাল পেয়েছি। এবার মিঃ ব্যানার্জী ওকে জিজ্ঞেস কবেন, আপনি কী করেন?

দাদা, আপনারা আমাদের চাইতে বয়সে অনেক বড়। প্লীজ আপনি বলবেন না।

অল রাইট! তুমিই বলব।

এবার সুদীপ খোলাখুলি বলে, দাদা, আমি এখনও বেকার। অনেক চেষ্টা করেও....

মিসেস ব্যানার্জী একটু হেসে বলেন, উনিও তো চাকরি পাবার

আগেই আমাকে বিয়ে করেন।

মিঃ ব্যানার্জী আবার প্রাণখোলা হাসি হেসে বলেন, যারা বেকার অবস্থায় বিয়ে করে, তারাই জীবনে সাকসেসফুল হয়।

সুদীপ আর মালা ওর কথা শুনে হাসে।

মিঃ ব্যানার্জী সুদীপকে বলেন, হাসছ কী? ঠিকই বলেছি। আর যদি এখনই বেকারত্ব ঘোচাতে চাও, তাহলে একদিন কল্যাণী চলে এসো।

সুদীপ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়।

আরে! অবাক হবার কী আছে? তুমি গ্রাজুয়েট তো?

হ্যাঁ।

তবে কিচ্ছু চিন্তার নেই। তুমি যেদিন আসবে সেইদিনই তোমাকে আমি কাজে লাগিয়ে দেব। মিঃ ব্যানার্জী সঙ্গে সঙ্গে পার্স থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে ওর হাতে দিয়ে বললেন, আমরা বারোই কলকাতা ফিরব। তারপর যে কোনো দিন ন'টা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে চলে এসো আদার ছ্যান স্যাটারডে-সানডে।

কলকাতায় ফেরার পর দাদা হাসতে হাসতে বললেন, এই সংসারে যারা সাহস করে জয় মা বলে ঝাঁপ দিতে পারে, তারা কখনও ব্যর্থ হয় না। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে অধিকাংশ মানুষেরই এই সাহসটুকু নেই।

বৌদি বললেন, ওসব যাই বলো, আসলে মালার ভাগ্যেই সুদীপের এই চাকরি হল। তা না হলে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এই চাকরি কেন হল?

সুদীপ এ যুগের ছেলে। গ্রহ-নক্ষত্র ভাগ্য-টাগ্য অত বিশ্বাস করে না। তবুও ও মনে মনে অনুভব করে, কোনো এক অজ্ঞাত অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে ঘন অন্ধকার রাত্রে জীবন-নদীর এক-একটি খেয়াঘাট নির্বিবাদে পার করে দিচ্ছে। একেই কী বলে ভগবান? নাকি ভাগ্য?

না, সুদীপ তার উত্তর জানে না, খুঁজে পায় না কিন্তু মর্মে মর্মে অনুভব করে, বিশ্বাস করে,—মানুষের জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটে,

যার কারণ বা যুক্তি জানা যায় না। তবু ঘটে। ঘটবেই।

কল্যাণী লোক্যালে বসে বসে সুদীপ কত কি ভাবে। অবাক হয়ে ভাবে। কাশীতে গিয়ে এই দাদা-বৌদির সঙ্গে আলাপ, নৈনিতালে গিয়ে ব্যানার্জী দম্পতির সঙ্গে পরিচয় হবার কোনো কারণও ছিল না, সম্ভাবনাও ছিল না। এমন শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে যে পবিচয় বা ভাব-ভালবাসা হতে পারে, তা ও স্বপ্নেও ভাবেনি। জি-পি-ও'র সামনে থেকে কত ফর্ম কিনে কত জায়গায় চাকরির জন্য আবেদনপত্র পাঠিয়েছে কিন্তু একটা ইন্টারভিউ পর্যন্ত পায়নি। অথচ ব্যানার্জী সাহেব এক কথায় ওকে ছ'শো টাকা মাইনেব স্টোর ক্লার্ক করে নিলেন। হঠাৎ পর পর যেন কয়েকটা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটে ওর জীবনটাই বদলে দিল। অখ্যাতি, অপযশ, অপবাদই যেন হঠাৎ পরম আশীর্বাদে পরিণত হল।

মা ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, কত লোকে কত কথা বলেছে কিন্তু আমি তো তোকে পেটে ধরেছি। আর কেউ না জানলেও আমি জানি, তুই কোনো দিন কোনো অন্যায় করতে পারিস না।

মালার মা ওর মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, এতদিন আমি তোমার মাসীমা ছিলাম। এখন কিন্তু তুমিও আমার ছেলে, আমিও তোমার মা।

শুধু বাবা-মা ভাই-বোনেরাই না, সারা বোসপাড়ার মানুষ সুদীপ আর মালার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। বঙ্কুদার রকে বসে পান-জর্দা চিবুতে চিবুতে কালোদা মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললেন, বুঝলি দীপু, আমি আগেই সবাইকে বলেছিলাম, তুই কিছু একটা করে সবাইকে চমকে দিবি বলেই মালাকে অমন করে লুকিয়ে বিয়ে করেছিস।

বিমান বেশ গম্ভীর হয়েই মালাকে বলল, দীপু তো তোমাকে নিয়ে কেটে পড়ে নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে নিল কিন্তু আমরা কাকে নিয়ে কেটে পড়ি বলতে পারো?

কেন, তোমার তো শিখা আছে। চাপা হাসি হেসে মালা বলে।

আরে দূর! দূর! ভিক্টোরিয়ায় গিয়ে যে পাশে বসতেই ভয় পায়, সে আবার····

সুদীপ, সমর, অলক আর মালা ওর কথায় হো হো করে হেসে ওঠে। হাসি থামলে সমর বলে, হ্যাঁরে দীপু, তোদের কল্যাণীর বাড়িতে আমাদের একদিন নেমন্তন্ন করবি না?

মালা সঙ্গে সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা তিনজনে শনিবার সকালেই আমাদের ওখানে চলে এসো। সারাদিন খুব হৈ-চৈ করা যাবে।

সুদীপ বেশ গম্ভীর হয়েই বলে, দেখছিস, আমার ওয়াইফ কত ভাল।

ওর কথায় সবাই হেসে ওঠে।

॥ চার ॥

কল্যাণীর দিনগুলো সত্যি আনন্দময় হয়ে উঠল। সুদীপ ব্রেক ফাস্ট খেয়ে অফিস যায়। আধ ঘণ্টার লাঞ্চ ব্রেক-এ এসে চট করে খেয়ে নেয়। তারপর পৌনে ছ'টার মধ্যেই বাড়ি।

মালা এখন পাকা গিন্নী। দুপুরবেলাতেই দু'বেলার রান্না সেরে রাখে। সুদীপ বাড়ি ফেরার আগেই ও বাথরুমে গিয়ে গা ধুয়ে চুল বেঁধে কাপড়-চোপড় বদলে নেয়। সুদীপের সাইকেলের বেল শুনতেই ও দরজা খুলে দাঁড়ায়। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে। সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে আসে না। ওর দিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসে।

কী হলো? ভিতরে এসো।

সুদীপ তবু অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

মালা আবার বলে, ভিতরে এসো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অমন হা করে তাকিয়ে থাকলে লোকে কি ভাববে বলো তো!

আমার সুন্দরী বেগমকে আমি হা করে দেখি আর অন্য যে কোনো ভাবেই দেখি, তাতে কার কী বলার আছে?

থাক, থাক, অনেক হয়েছে। ভিতরে এসো।

সাইকেল বারান্দায় রেখে ঘরের মধ্যে ঢুকেই সুদীপ পর্দা টেনে দিয়ে মালাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি দিন দিন আরো সুন্দরী হচ্ছো।

তা তো বটেই।

সত্যি বলছি।

কী এমন কারণ ঘটল যে দিন দিন আরো সুন্দরী হবো?

মনে শান্তি, তাব ওপব বিয়ের জল পড়েছে না!

ওর দু'হাতেব মাঝখান থেকে মালা ছিটকে বেবিয়ে যায়। রান্নাঘরে চা করতে কবতে নিজেব মনে খুশীর হাসি হাসে। মনে মনে ভাবে, দীপ বোধহয় কথাটা ঠিকই বলেছে। আয়নাব সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখেই নিজেব ভাল লাগে। তাছাড়া আশেপাশেব বাড়ির সবাই বলছে।

চা-টা খেয়ে সুদীপ বাথরুমে যায়। স্নান করে। তারপব পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে বসতে না বসতেই মালা কিছু খেতে দেয়। মালাও সামান্য কিছু খায়। খেতে খেতেই গল্প হয়—জানো দীপ, আজ দুপুরে আমাদের দারুণ আড্ডা জমেছিল।

আমাদের মানে?

লিপি, মিত্রাদি আর বেলাদি হঠাৎ এসে হাজির। মালা হাসতে হাসতে বলে।

কখন খাওয়া-দাওয়া কবলে?

সে আর বলো না! মুখে হাসি নিয়েই মালা বলে যায়, এমন আড্ডাই জমেছিল যে কেউই আর আড্ডা ছেড়ে উঠতে চায় না। শেষপর্যন্ত তিন বাড়ি থেকে কিছু কিছু রান্নাবান্না এখানে এনে সবাই ভাগযোগ করে খাওয়া হলো। ও মাথা নেড়ে ভুরু নাচিয়ে বলে, আজ সত্যি খুব মজা হয়েছে!

কী নিয়ে আড্ডা হলো?

কী নিয়ে কথা হয় নি? কে বিয়ের আগে কার সঙ্গে প্রেম করেছে, স্বামীরা কাকে কি রকম করে আদর করে, ভালবাসে····

ভেরি গুড সাবজেক্ট !

সেই সঙ্গে লিপির গান।

বাঃ! চমৎকার!

সত্যি, আজ দুপুরটা বেশ কেটেছে।

সুদীপ বরাবরই একটু ঘরকুনো। আগে ছাদের ঐ ঘর বা বোস-পাড়ার মধ্যেই ওর দিনরাত কেটে যেত। এখন যেন আরো ঘরকুনো হয়েছে। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর আর নড়তে চায় না। পিঠে দুটো বালিশ দিয়ে আধ শোয়া অবস্থায় বই পড়ে। তারপর খেয়েদেয়ে ঘুম। এই ওর দৈনন্দিন জীবন। তবে হ্যাঁ, মাসে অন্তত দু'বার কলকাতা যায়। দাদা-বৌদি, বাবা-মা'র কাছে। কোনো কোনো বার সিনেমা-থিয়েটারও দেখে কিন্তু কল্যাণীতে থাকলে বিশেষ বেরুতে চায় না। আবার মালার রোজ একটু না বেরুলে ভাল লাগে না। কোনো কোনোদিন ও জোর করে সুদীপকে নিয়ে বেরোয়। সন্ধ্যের পর একলা একলাও আশেপাশের বাড়িতে যায়।

আশেপাশের বাড়ির লোকজনরাও বেশ ভাল। লিপির স্বামী জয়ন্ত ডাক্তার। মাত্র দু'বছর আগে পাশ করে কল্যাণীরই একটা নার্সিংহোমে চাকরি করছেন। বেলাদির স্বামী বিবেকদা সিভিল এঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্ট। কল্যাণীতে নিজের বাড়ি তৈরি করার পরই সরকারী চাকরি ছেড়ে নিজের কনস্ট্রাকশন ফার্ম খুলেছেন। বিবেকদার ছোটভাই অভীকও দাদা-বৌদির কাছে থাকে ও নৈহাটির একটা জুট মিলে এ্যাসিসট্যাণ্ট পার্সোন্যাল অফিসার। সুদীপের চাইতে বছর তিনেকের বড় হলেও এখনো বিয়ে করে নি। এ পাড়ায় সুদীপই ওর একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মালা বলে, তোমাদের দু'জনের যে কী করে বন্ধুত্ব হলো, তা ভেবে পাই না।

অভীক জিজ্ঞেস করে, কেন?

তোমাদের দু'জনের স্বভাবের মধ্যে কোনো মিল আছে? মালা নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেয়, তুমি তো কালবৈশাখী! কখন কোথায় কী করবে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আর দীপ? স্নিগ্ধ হেমন্ত।

ওর কথা শুনে দু'জনেই হাসে। হাসতে হাসতেই অভীক বলে, মালা, তুমি কবিতা লেখো। সুদীপের সংসারে হাড়ি ঠেলার জন্য তুমি জন্মাও নি।

মালা ঠিকই বলেছে। সুদীপ ঘরকুনো আব অভীক ওর মোটর সাইকেলে সারাদিন চক্কর দিয়ে বেড়ায়, সুদীপ সাদাসিধে জীবন-যাপন করতে পাবলেই খুশি কিন্তু অভীক অত্যন্ত সৌখীন। ও হায়দ্রাবাদের নিজাম হবাব স্বপ্ন দেখে। অভীক হৈ-হৈ রৈ রৈ করে বাঁচতে চায়। ও মাঝে মাঝে মোটব সাইকেলেব পিছনে সুদীপ আর মালাকে নিয়ে নৈহাটি টকিজে নাইট শো সিনেমা দেখতে যায়। মিত্রাদিব স্বামী বিভাসদা কল্যাণী ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাসেব লেকচাবার। মিত্রাদি আব বিভাসদা দু'জনেই সমান আড্ডাবাজ।

সব মিলিয়ে সুদীপ আব মালা ভালই আছে। প্রাচুর্য না থাকলেও কোনো অভাব নেই। এইভাবেই দুটো বছব বেশ কেটে গেল। তবে এব মধ্যে সুদীপ বিশেষ ছুটিছাটা নিতে পারে নি। ছুটির বদলে টাকা নিয়ে বাবার কিছু দেনা শোধ কবেছে, কিছু ব্যয় কবেছে নিজের সংসারের জন্য। স্বামী-স্ত্রী মিলে ঠিক করল, এবাব ছুটি নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাবে। হাজাব হোক বেড়াতে গেলে ব্যানার্জী সাহেবের কোম্পানী থেকে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। ঐ টাকার সঙ্গে আর কিছু খরচ কবলেই বেশ কিছুদিন বেড়ানো যাবে। মালা বলল, আমি কোনোদিন সমুদ্র দেখিনি। এবার সমুদ্রের ধারে কোথাও বেড়াতে যাব। দু'জনে মিলে অনেক হিসেব-নিকেশের পর ঠিক হলো, পুরী। ওখানে গেলে কোনার্ক-ভুবনেশ্বরও দেখা হবে। সুদীপ ছুটির দরখাস্ত করার আগেই মহিলা মহলে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। তার পরদিনই অভীক এসে হাজির—হ্যারে সুদীপ, তোরা পুরী যাচ্ছিস?

কেন, তুই যাবি?

অভীক উত্তর দেবার আগেই মালা বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, অভীকদা চলুন। খুব মজা হবে।

মাথা দুলিয়ে অভীক বলল, খুব মজা হবে তাই না, কিন্তু আগে তো আমার কথা মনে হয় নি ?

সুদীপ একটু হেসে বলল, ওরে, আমরা শুধু আলাপ-আলোচনাই করেছি। আমি এখনও ছুটির এ্যাপ্লিকেশন করি নি।

কিন্তু তোর বউ সারা পাড়ায় এমন পাবলিসিটি দিয়েছে যে আমি ভাবছিলাম, তোরা কালই যাচ্ছিস। অভীক মালার দিকে তাকিয়ে বলে, চট করে কফি কর। কফি না খেলে ব্রেন খুলবে না। এক্ষুণি সব প্ল্যান-প্রোগ্রাম ফাইন্যাল করছি।

কফি খেতে খেতেই দুই বন্ধুতে ঠিক করে সাত তারিখ সোমবার থেকে ছুটি নিলে পাঁচই শনিবার রওনা হওয়া যাবে। সোজা পুরী। তারপর ওখান থেকে ভুবনেশ্বর-কোনার্ক। সম্ভব হলে দু'একদিনের জন্য চিল্কা। মালা জিজ্ঞেস করল, আমরা কী পুরো ছুটিটাই উড়িষ্যায় কাটাব ?

সুদীপ বলল, না, না, একমাস থাকব কেমন করে ? দু'চারদিন তো বাবা-মার কাছেও থাকতে হবে।

বাবা-মা'র কাছে তো হরদমই থাকছি। ছুটি নিয়ে বাগবাজারে থাকার কোন মানে হয় ?

না, না, কয়েকটা দিন মার কাছে থাকতেই হবে।

অভীক বলল, এতদিন পর যখন ছুটি নিচ্ছি, তখন দিন পনেরো নিশ্চয়ই ওখানে থাকব। তারপর দেখা যাক কি হয়।

সুদীপ বলল, হ্যাঁ, দিন পনেরো নিশ্চয়ই থাকব। একটু থেমে বলল, তাছাড়া দু'বছর এক নাগাড়ে কাজ করে এখন সত্যি বেশ টায়ার্ড মনে হচ্ছে। কিছুদিন টানা বিশ্রাম না নিলে আর কাজ করতে পারব না।

মালা বলল, সেই জন্যই তো বলছিলাম, পুরো ছুটিটা বাইরে থাকলে শরীর মন দুইই ভাল হবে।

অভীক বলল, আচ্ছা অত বক বক না করে আগে তো যাওয়া যাক। তারপর ফেরার কথা ভাবা যাবে।

ওদের পুরী যাওয়া নিয়ে সারা পাড়ায় এমন হৈচৈ শুরু হয়ে গেল যে লিপি একদিন হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁরে মালা, তোরা তিনজনে কি যুদ্ধে যাচ্ছিস? নাকি ঠিক করেছিস, সমস্ত উড়িষ্যাটাই কিনে নিবি?

ওর কথা শুনে মালা না হেসে পারে না। বলে, অভীকদা প্রায় সেই রকমই শুরু করেছে।

তবে অভীকদা সত্যি খুব জমাটি লোক। একবার আমরা দু'জনে আর অভীকদা একসঙ্গে দার্জিলিং গিয়েছিলাম। সত্যি, কি আনন্দে আমরা দিন কাটিয়েছিলাম, তা ভাবা যায় না। ওর মত ভাই-বন্ধু-দেওর হয় না।

ঠিক বলেছিস। অভীকদাকে আমারও খুব ভাল লাগে।

ওকে কার ভাল লাগে না?

সত্যিই তাই।

যাবার আগের দিন বেলাদি এসে অনেক গল্পগুজব করার পর বললেন, ঠাকুরপো যখন যাচ্ছে তখন তোদের কোন চিন্তা নেই। সব ঝক্কি-ঝামেলা ও একাই সামলাবে। তোদের গায় আঁচড়টা পর্যন্ত লাগতে দেবে না।

সত্যিই তাই। স্টেশন থেকে নেমে সোজা ট্যুরিস্ট বাংলো। দুটো ঘর আগেই বুক করা ছিল। ঘর দু'খানিও বেশ ভাল। দু'টো ঘর থেকেই সমুদ্র দেখা যায়। নিচেই ট্যুরিস্ট অফিস। কোনার্ক-ভুবনেশ্বর বা চিল্কা যেতে হলে ওখান থেকেই সব ব্যবস্থা করা যাবে। দশ জায়গায় ছোটাছুটি করতে হবে না। তাছাড়া জগন্নাথদেবের মন্দিরও বিশেষ দূর না।

কিরে সুদীপ, ঘর-টর ঠিক আছে তো?

সুদীপ একটু হেসে বলে, তুই যেখানেই আমাকে রাখবি, সেখানেই আমি প্রাণভরে ঘুমোব আর বই পড়ব।

অভীক অবাক হয়ে বলে, সে কিরে! বেড়াতে এসে ঘরে বসে থাকবি?

মালা মন্তব্য করে, ও যা ঘরকুনো তা আপনি ভাবতে পারবেন না।

সুদীপ বলল, আমি বিশ্রাম করতে এসেছি। ভুলে যাস না দু'বছর এক টানা অফিস করেছি।

আমি কিন্তু বেড়াতে এসেছি। মালা বলে।

সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে বলে, নিশ্চয়ই তুমি বেড়াবে। দু'বছর একটানা সংসার করেছ। তুমি কেন বেড়াবে না?

অভীক বলে, তুই ঘরে বসে থাকবি আর আমরা ঘুরে বেড়াব, তাই কখনো হয়?

সকাল-বিকেল দু'বেলাই ওরা তিনজনে একসঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যায়। কত মানুষের কলগুঞ্জনের মাঝেও মহাসিন্ধুর গর্জন শুনতে শুনতে সুদীপ হঠাৎ আনমনা হয়ে যায়। অবাক হয়ে দেখে দিগন্ত-বিহীন মহাসমুদ্র। মনে মনে ভাবে, সেই আদি অনন্ত কাল ধরে অজানা অচেনা পৃথিবীর অজ্ঞাত রহস্য আবিষ্কারের নেশায় পাগল হয়ে কত লক্ষ লক্ষ নাবিক, যোদ্ধা, সেনাপতি, সওদাগর এই অতল-গভীর সীমাহীন সমুদ্রগর্ভে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এই সমুদ্র গর্জন যেন তাদেরই অতৃপ্ত আত্মার সম্মিলিত হাহাকার! নাকি এই রত্নাকরের সমস্ত দম্ভ চূর্ণ করে কালে কালে যেসব বীর দেশ-দেশান্তরে গিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, এ তাদেরই সম্মিলিত আনন্দ উল্লাস?

সুদীপ বলে, আমি এখানেই একটু বসছি। তোরা বেড়াবি তো বেড়িয়ে আয়।

তুই সত্যি বসে থাকবি?

হ্যাঁ।

চলো মালা, আমরা একটু হেঁটে আসি।

শুধু সেদিন না, রোজই কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেই সুদীপ কোথাও চুপ করে বসে থাকে। ওরা দু'জনে ধারে-কাছেই ঘুরে বেড়ায়। কোন কোনদিন অভীক বেশি জোর-জুলুম করলে ও বলে, একটু প্রাণ ভরে সমুদ্র দেখব না?

তুই ব্যানার্জীর কারখানায় স্টোর্সে কাজ না করে কবিতা লেখ।

সুদীপ হাসতে হাসতে বলে, তোর মত পাঠক পাবার ভয়েতেই তো কবিতা লিখি না।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ওরা দু'জনে ফিরে আসে। অভীক হাসতে হাসতে বলে, নারে সুদীপ, তোর বউকে নিয়ে আমি আর ঘোরাঘুরি করব না।

সুদীপ একটু চাপা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করে, কেন?

আরে দূর! পরস্ত্রী নিয়ে ঘোরাঘুরি করে আনন্দ আছে নাকি?

অভীকের কথা শুনে ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই হাসে।

ওরা হাসলেও অভীক গম্ভীর হয়ে বলে, একটা মেয়েকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াব অথচ তার হাত ধরতে পারব না, তাকে দু'চারটে ফিল্মী ডায়ালগ শোনাতে পারব না····

মালা ঠোঁট উল্টে মাথা ঘুরিয়ে চাপা হাসি হেসে বলে, অত যদি সখ থাকে তাহলে যাকে নিয়ে এককালে মোটর সাইকেলের পিছনে বসিয়ে কলেজে পৌঁছে দিতেন, তাকে সঙ্গে আনলেন না কেন?

সুদীপ হো হো করে হেসে ওঠে।

অভীক বলে, সে গল্পও বৌদির কাছে শোনা হয়ে গেছে?

শুধু বেলাদি কেন, সারা কল্যাণী টাউন শিপের লোকই আপনার সে প্রেমের কাহিনী জানে।

দু'একবার ট্রেনের গণ্ডগোলের জন্য সীতাকে আমি কলেজে পৌঁছে দিয়েছি বলেই····

কেন, আপনি তাকে রোজ চকোলেট প্রেজেণ্ট করতেন না? মালা জেরা করে।

রোজ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, রোজ।

বৌদি তাই বলেছে?

সে যেই বলুক। সাহস থাকলে স্বীকার করুন।

আরে, চকোলেট কি আমি কম মেয়েকে খাইয়েছি? কিন্তু তারপর

যে যার সুদীপকে নিয়ে ভিড়ে গেল।

মালা আবার ঠোঁট উল্টে বলে, ইস! কি দুঃখ!

সুদীপ মালাকে বলে, অভীককে না টেনে আনলে আমরা সত্যি বোর হয়ে যেতাম।

অভীক মাথা নেড়ে বলে, আমি আমার দুঃখের জ্বালায় ছটফট করছি আর তোরা দু'জনে মজা দেখছিস!

দিনমণি অস্তাচলে গিয়েছেন অনেক আগেই। মহাসিন্ধুর উপস্থিতি অনুভব করা গেলেও সে এখন অন্ধকারের ঘোমটা দিয়ে চোখের আড়ালে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কিছু পর্যটক এখনও এখানে রয়েছেন। কেউ গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টা করছেন, কেউ কেউ মন দেয়া-নেয়া করছেন। সেই আবছা অন্ধকারের মধ্যে বসেও ওরা তিনজনে কত কথা বলেন।

ট্যুরিস্ট বাংলোয় ফেরার পথে হঠাৎ অভীক বলে, তোরা যা, আমি একটু ঘুরে আসছি।

এখন আবার কোথায় যাবি? সুদীপ জিজ্ঞেস করে।

এখুনি আসছি।

আর কিছু না বলে অভীক ট্যুরিস্ট বাংলো পাশে রেখে এগিয়ে যায়। হ্যাঁ, একটু পরেই ও ফিরে আসে। হাতে একটা ভাঁড় আর একটা ঠোঙা।

তুই কী দই-মিষ্টি কিনতে গিয়েছিলি? সুদীপ প্রশ্ন করে।

ওরে, দই না, দইপোড়া। অভীক একটু হেসে বলে. উড়িষ্যায় এসে জগন্নাথ দর্শনের মত দইপোড়া খাওয়াও কম্পালসারী।

মালা বলল, আপনি কী রোজই মিষ্টি কিনবেন?

ভুলে যাও কেন, তোমার স্বামী মিষ্টি খেতে ভালবাসে।

তাই বলে রোজই মিষ্টি আনতে হবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। অভীক মালার চোখে চোখ রেখে বলে, তুমি যেমন চরকিবাজীর মত চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরে বেড়াতে ভালবাস, ও তেমনি চুপচাপ বসে থাকতে ভালবাসে। তোমার ভাল লাগা-ভালবাসার চাইতে ওর ভাল লাগা-ভালবাসার দাম কী আমার কাছে কম?

মালা চুপ করে থাকে না। বলে, আজ সকালে আপনি হরিণের চামড়ার কি সুন্দর চটি ··

দাদার চটি কিনলাম, আমার চটি কিনলাম আর সুদীপের চটি কিনব না?

কিনবেন না কেন কিন্তু দাম····

ওরে বাপু, আমি আমার বন্ধুকে কি দিই, না দিই, তা নিয়ে তোমার অত চিন্তা কিসের?

পরের দিন সকালে জগন্নাথ দর্শন করে বেরুবার পর সুদীপ একশ' টাকার তিনখানা নোট অভীকের হাতে দিয়ে বলল, আমি শাড়ি-টাড়ি কিনতে পারি না। তুই ওকে নিয়ে··

প্রেম করে বিয়ে করতে পারো আর শাড়ি কিনতে পারো না?

তুই যেমন পছন্দ করে সুন্দর সুন্দব শাড়ি কিনতে পারিস কিন্তু প্রেম করতে পারিস না···

মালা বলে, যদি তিনশ'র মধ্যে না হয় তাহলে আমি অভীকদাকে কিছু দিতে বলব। তুমি পরে ওকে দিয়ে দিও।

আচ্ছা!

ওরা শাড়ি কিনতে যায়। সুদীপ মন্দিরের সামনের দোকানগুলোর সামনে ঘোরাঘুরি করে উড়িষ্যার লোকশিল্পের শত শত নমুনা দেখে মুগ্ধ হয়। ছোট ছোট মূর্তিগুলোও কি নিখুঁত! কাপড় থেকে শুরু করে কাঠ-পাথর সবকিছু নিয়েই এরা কাজ করে। সব কাজেই কি আশ্চর্য শিল্পবোধ! বড় বড় শহরের লোকজনেরা এদেরই বলে অনগ্রসর? আকাশের বুকে দুটো চিমনি খাড়া করলেই কী উন্নত হওয়া যায়? যে দেশের অতি সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই সূক্ষ্ম শিল্পবোধ আছে, রসবোধ আছে, সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, তারা কী কখনও অনগ্রসর হতে পারে? অসম্ভব। তারা উপেক্ষিত, অনগ্রসর নয়।

শাড়ি কিনে মালার সে কি আনন্দ! প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরে ঢুকেই সুদীপকে বলে, দেখ, দেখ, কি সুন্দর শাড়ি কিনেছি।

শাড়িটা দেখে সুদীপেরও পছন্দ হয়। বলে, শাড়িটা সত্যিই খুব

সুন্দর। কত দাম পড়ল ?

অভীকদা বলতে বারণ করেছেন।

কেন ?

তা তোমার বন্ধুকেই জিজ্ঞেস করো।

সুদীপ অভীকের দিকে তাকিয়ে বলে, কি রে, শাড়িটার কত দাম পড়ল।

আমি বৌদির শাড়ি আর মালার শাড়ির দাম একসঙ্গে দিয়েছি। কোনটার কত দাম বলতে পারব না।

দুটো শাড়ির জন্য যা দিয়েছিস, তার অর্ধেক হবে এই শাড়ির দাম।

বৌদির শাড়ি অনেক দামী।

বাজে বকিস না।

অনেকবার অনেক রকম ভাবে অনুরোধ-উপরোধ করেও ফল হল না। শেষ পর্যন্ত অভীক বলল, তুই তো ভাল করেই জানিস আমি হিসেব-নিকেশ করা শিখিনি। ইনকামট্যাক্স-প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড-ইন্সিওরেন্সের টাকা কেটেকুটে ঠিক কত টাকার চেক অফিস থেকে ব্যাঙ্কে পাঠায়, তা পর্যন্ত আমি জানি না।

সে আর জানি না!

তুই কখনও আমার কাছে টাকা-পয়সার হিসাব চাইবি না আর আমি দিতেও পাবব না।

সুদীপ হেসে বলে, তুই বেহিসেবী না হলে কী আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় ?

কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে ঠিক ছিল ওরা কিছুদিন পুরীতে থাকার পর কয়েকটা দিন ভুবনেশ্বরে কাটাবে। যাতায়াতের পথে কোনার্ক দেখবে কিন্তু এখানে কয়েকটা দিন কাটাবার পরই সুদীপ আর বিশেষ নড়তে চাইল না। বলল, হ্যাঁরে অভীক, শুধু শুধু টানাপোড়েন করতে আর ইচ্ছে করছে না। এখানেই বেশ আছি। তাছাড়া ভুবনেশ্বরে এমন পরিবেশও পাব না, এমন শান্তিও পাব না।

তা ঠিক। অভীক বলে, হাজার হোক ভুবনেশ্বর স্টেট ক্যাপিটাল।

সেখানে লোকজন গাড়ি-ঘোড়ার ভীড় তো থাকবেই।

শেষ পর্যন্ত ওরা একদিন সকালে ট্যুরিস্ট বাসে চেপে কোনার্ক আর ভুবনেশ্বর ঘুরে এলো। কোনার্কে গিয়ে অভীক ওদের বলল, আমি তোদের সঙ্গে কোনার্ক মন্দির দেখব না।

কেন? মালা প্রশ্ন করে।

ওহে সুন্দরী যুবতী, স্বামীর সঙ্গে মন্দিরগুলো ভাল করে দেখলেই বুঝতে পারবে।

সুদীপ হাসে।

সত্যি, অভীক একলা একলাই ঘুরল। পরে বাসে ওঠার পর অভীক হাসতে হাসতে মালাকে জিজ্ঞেস করে, কিহে সুন্দরী, তোমাদের সঙ্গে না গিয়ে ঠিক করেছি তো?

মালা শুধু চাপা হাসি হেসে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখে কিছু বলে না।

সারাদিন ধবে ঘোরাফেরা করা সন্ধ্যেব দিকে পুরী ফিরতেই সুদীপ বলল, ভীষণ টায়ার্ড লাগছে।

মালা বলল, অত ওঠা-নামা ঘোবাঘুরি, টায়ার্ড হওয়াই তো স্বাভাবিক।

কী মালা, তুমিও টায়ার্ড? অভীক প্রশ্ন করে।

সে তো একশ'বার।

ঠিক আছে, আমি ওষুধেব ব্যবস্থা করছি। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই অভীক ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মালা বলে, অভীকদা আবার কোথায় কি ওষুধ আনতে গেল, তা কে জানে।

সুদীপ বলল, ও যে ওষুধই আনুক, তা আমাদের খেতে হবে। না খেয়ে ঐ পাগলের হাত থেকে বাঁচা যাবে না।

তা ঠিক।

কিছুক্ষণ পরই অভীক এক বোতল ব্রাণ্ডি নিয়ে হাজির। বলে, নে, নে, উঠে বস। এক্ষুণি শরীর তাজা করে দিচ্ছি।

বোতল দেখেই মালা ভয় পায়। বলে, আমি আপনার এই ওষুধ খাচ্ছি না।

সুদীপের দিকে তাকিয়ে অভীক একটু হেসে জিজ্ঞেস করে, কিরে, তুইও কী তোর বউয়ের মত ব্রাণ্ডি খেতে ভয় পাচ্ছিস ?

সুদীপ জবাব দেবার আগেই মালা বলল, ভয় আমি পাই নি।

তবে খাবে না কেন ?

খেলে তো নেশা হবে।

অভীক হেসে বলে, একটু ব্রাণ্ডি খেলে শরীর ভালই লাগবে। তোমাকে বা তোমার স্বামীকে মাতাল করার জন্য আমি ব্রাণ্ডি আনি নি।

এতক্ষণ পর সুদীপ বলল, একটু-আধটু ব্রাণ্ডি খাওয়া সত্যি ভাল।

ব্যস ! অভীক সঙ্গে সঙ্গে তিনটি গেলাসে ব্রাণ্ডি ঢালে। জল দেয়। তারপর ওদের দু'জনের হাতে দুটো গেলাস তুলে দিয়ে নিজে একটা গেলাস তুলে নিয়েই বলে, চিয়ার্স !

ওরা দু'জনে হাসতে হাসতেই প্রায় একসঙ্গে বলে, চিয়ার্স !

দু'এক চুমুক খেতে না খেতেই বেয়ারা এসে ফিস-ফিঙ্গার দিয়ে যায়। মালা বলে, আপনার উদ্যোগ-আয়োজনে কোনো ত্রুটি নেই।

ঐ যে তোমার স্বামী বলেছে, আমি সুন্দর সুন্দর শাড়ি পছন্দ করতে পারি কিন্তু প্রেম করতে পারি না ! ঐ একটা ত্রুটি ছাড়া আমার আর কোনো ত্রুটি নেই। অভীক প্রায় না থেমেই বলে, এই ট্যুরটা কেমন হচ্ছে বলো।

সুদীপ বলল, রিয়েলী ওয়াণ্ডারফুল ! তুই না এলে এর সিকি ভাগও আমরা এনজয় করতে পাবতাম না।

সত্যি, আপনাকে না নিয়ে আমরা আর কোথাও বেরুচ্ছি না।

॥ পাঁচ ॥

ছুটি কাটিয়ে কল্যাণীর বাড়িতে পা দিতে না দিতেই লিপি ছুটে এসে মালাকে বলল, এই দু'তিন দিনের মধ্যে কত লোক তোদের সঙ্গে দেখা করতে এসে ফেরত গেল।

সুদীপ অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করল, কারা এসেছিল?

আগে বলুন, মিষ্টি খাওয়াবেন, তাহলে একটা ভাল খবর দেব।

নিশ্চয়ই খাওয়াবো।

আপনার ভাই প্রদীপ খড়্গপুর আই-আই-টি'তে চান্স পেয়েছে।

রিয়েলী! খবরটা শুনে সুদীপ আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।

মালা বলল, যাক, ওর স্বপ্ন তাহলে সত্যি সার্থক হলো।

অনেক খবব না, আরো একটা খবব ছিল। বিমান দিন সাতেকেব জন্য কলকাতা এসেছিল। আজ সকালের প্লেনেই দিল্লী ফিরে গেল। কাল দুপুরের দিকে কল্যাণী এসেছিল ওদের সঙ্গে দেখা করতে। দেখা হলো না বলে একটা চিঠি লিখে গেছে। খামের চিঠিটা লিপি সুদীপের হাতে দিতেই ও সঙ্গে সঙ্গে খাম ছিঁড়ে চিঠি পড়তে শুরু করে। লিপি আর দাঁড়ায় না, চলে যায়।

বিমানের চিঠিটা পড়তে পড়তেই একবার এক মুহূর্তের জন্য সুদীপ মালার দিকে তাকিয়ে বলে, জানো বেগম, বিমান গাজিয়াবাদের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে ফরিদাবাদের একটা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানীতে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজার হয়েছে। কত মাইনে জানো?

কত?

আড়াই হাজার।

বিজনেশ ম্যানেজমেন্টের ডিপ্লোমা পাশ করেই আড়াই হাজার!

চিঠিটা পড়তে পড়তেই মুখ না তুলে সুদীপ বলে, শুধু ডিগ্রীটাই তো সব নয়। কাজ করার ক্ষমতা আছে বলেই এই মাইনে ছাড়াও দিল্লীতে বাড়ি আর টেলিফোন দিয়েছে।

বল কী?

এবার সুদীপ মুখ তুলে হেসে বলে, আমাকেও ওখানে জয়েন করতে বলছে। বাড়ি ছাড়াও হাজার দেড়েক টাকা মাইনে দেবে।

সত্যি?

সুদীপ চিঠিটা ওর হাতে দিয়ে বলে, পড়ে দেখ।

চিঠিটা পড়েই মালা বলে, চলো আমরা চলে যাই।

ব্যানার্জী সাহেবের চাকরি কী এভাবে হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া উচিত ?

সুদীপ একটু থেমে বলে, যে দুর্দিনে উনি এক কথায় আমাকে চাকরি দেন, তা কী ভুলতে পারি ?

তা ঠিক কিন্তু এইরকম সুযোগ আর কি আসবে ?

তাও ঠিক।

সন্ধ্যেবেলায় এসে অভীক চিঠিটা পড়েই বলল, তুই একটা কাজ কর।

সুদীপ বলল, কী করব ?

তুই যেভাবেই হোক দিন সাতেকের জন্য দিল্লী যা। ওখানে গিয়ে নিজে চোখে দেখ, কোম্পানীটা কী রকম, ঠিক মাইনে কত দেবে, আর কি কি সুবিধে পাবি····

মালা বলল, ঠিক বলেছেন।

অভীক বলে যায়, তারপর সবকিছু যদি তোর পছন্দ হয় আর ওরা তোকে সত্যি সত্যি এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়, তাহলে ফিরে এসে মিঃ ব্যানার্জীকে খোলাখুলি সব বলবি। আমার ধারণা উনি তোকে হাসিমুখে ছেড়ে দেবেন।

মালা বলল, ভেরী গুড আইডিয়া।

সুদীপ মিনিট খানেক চুপ করে থাকার পর বলে, তুই ঠিকই বলেছিস কিন্তু এখনই আবার দিল্লী যাই কী করে ?

কেন ? তোর তো এখনও দশ দিন ছুটি আছে।

ছুটি আছে ঠিকই কিন্তু দিল্লী যাওয়া কী কম খরচের ? এই বেড়িয়ে ফিরলাম····

অভীক সঙ্গে সঙ্গে বলে, সেজন্য তোকে চিন্তা করতে হবে না। কাল হবে না, পরশুর ডিল্যুক্সেই আমি তোকে চড়িয়ে দেব।

সুদীপ হেসে বলল, কিন্তু একটা শর্ত।

কী ?

এই টাকাটা তোকে ফেরত নিতে হবে।

মালা স্বামীকে সমর্থন করে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

অভীক বলল, টাকা আমি নিতে পারব না কিন্তু সত্যি যদি তোরা

দিল্লী চলে যাস, তাহলে তোরা আমাকে একবার দিল্লী ঘুরিয়ে দিবি।

এগ্রিড।

ঠিক হলো, এখানে কাউকে কিছু না জানিয়ে কালই সুদীপ মালাকে নিয়ে বাগবাজার যাবে। সবাই জানবে, ওরা ছুটির বাকি ক'টা দিন ওখানেই কাটাবে। তারপর সুদীপ দিল্লী থেকে ফিরে এলে আবার ওরা কল্যাণী ফিরে আসবে। বিমানের চিঠির খবর বোসপাড়ার কেউ জানেন না দেখে ওরাও কিছু বলল না। সবাই জানলেন, হঠাৎ অফিসের কাজে সুদীপ দিল্লী যাচ্ছে। অভীক আর মালা ওকে ট্রেনে চড়িয়ে দিল। ট্রেন ছাড়ার আগে অভীক বলল, তেমন কোনো জরুরী খবর থাকলে আমাকে অফিসে ট্রাংকল করে জানাস।

বিমান নিউ দিল্লী স্টেশনে ওকে রিসিভ করে সোজা নিয়ে চলে গেল ওর ইস্ট অফ কৈলাশের বাড়িতে। সুন্দর দোতলা বাড়ি। সামনে লন আর বাগান। একতলাটা বিমানের, দোতলায় কোম্পানীর গেস্ট হাউস। কি ছিমছাম সাজান গোছান। প্রায় বড় বড় হোটেলের মত। দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় সুদীপ। বিমান বলল, তুই বিশ্রাম-টিশ্রাম করে বাথরুমে যা। আমি দেড়টা-দুটো নাগাদ চলে আসব!

তুই কি অফিস যাচ্ছিস?

হ্যাঁ।

তোর অফিস কি ফরিদাবাদে?

না, না, আমার অফিস এই কাছেই নেহরু প্লেসে। আমাদের ফ্যাক্টরী ফরিদাবাদে।

ও!

বিমান গাড়িতে ওঠার আগে চৌকিদার আর চাকরটাকে বলল সাহাব কো ঠিক সে দেখ্-ভাল করনা।

দুজনেই একসঙ্গে জবাব দেয়, জী সাব!

সেবা-যত্ন বিধিব্যবস্থা ঘরদোর বাথরুম—সবকিছু দেখেই সুদীপের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। দেড়টা-দুটো না, বিমান এলো আড়াইটে

নাগাদ। ঘরে ঢুকেই বলল, কিরে, খুব ক্ষিদে লেগেছে নিশ্চয়ই ?

না, না। সুদীপ হেসে বলে, ট্রেনে ব্রেকফাস্ট করেছি। তারপর এখানে এসেও কফির সঙ্গে কেক-পেস্ট্রি খেলাম।

বিমান জামা-কাপড় বদলাতে না বদলাতেই দরজায় নক্ করার আওয়াজ।

কাম ইন !

চৌকিদার ট্রে করে দুটো বীয়ার, দুটো জাগ আর কিছু বাদাম নিয়ে আসতেই বিমান জিজ্ঞেস করল, খানা রেডি ?

জী সাব।

আমরা আধঘণ্টা পরে খাবো।

চৌকিদার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সুদীপ একটু হেসে বলল, এখন বীয়ার খাবি ?

ওরে শালা, এটা বোসপাড়া না। এখানে মানুষকে যেমন খাটতে হয়, তেমনি আয় করে, আনন্দ করে।

বীয়ার খেতে সুদীপের তেমন আগ্রহ না থাকলেও বিমানের আগ্রহ ও আন্তরিকতার জন্য আপত্তি করে না। বীয়ার খেতে খেতে কত হাসি-ঠাট্টা গল্পগুজব হয়। হাজার হোক আবাল্য বন্ধুত্ব ! তারপর এতদিন পর এই অপ্রত্যাশিত পরিবেশে দুজনের আড্ডা জমেছে। কখন যে দুটো বোতল শেষ হয়ে যায়, তা কেউই যেন বুঝতে পারে না। আবার দু বোতল বীয়ার আসে। ঐ হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজবের মাঝখানেই বিমান বলে, একবার ফ্রন্টিয়ার মেল'এ বোম্বে থেকে আসার সময় আমাদের এই কোম্পানীর মালিক মিঃ অটোয়ালের সঙ্গে আলাপ হয়। বলতে পারিস একসঙ্গে মাল টানতে টানতে বন্ধুত্বই হয়ে গেল।

ভদ্রলোক পাঞ্জাবী ?

হ্যাঁ, সর্দারজী। তবে সত্যি মানুষটা ভাল।

তারপর ?

তারপর মাঝে মাঝেই আমাদের দেখাশুনো হতো। আর দেখাশুনো হলেই ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে কথাবার্তা। অনেকদিন ধরেই

আমাকে জয়েন করতে বলছিলেন কিন্তু এখন অনেক এক্সপ্যানশান করছেন বলে আমিও আর আপত্তি করলাম না।

সুদীপ বলে, ভালই করেছিস। গ্রোয়িং কনসার্নে সব সময় বেশী সুযোগ পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, সেই ভেবেই জয়েন করেছি। বিমান একটু থেমে বলে, তবে এখানে কোথাও কিছুদিন ভালভাবে কাজ করলেই অন্য কোম্পানী থেকে ভাল ভাল অফার আসে।

তাই নাকি ?

বিমান হেসে বলে, ওরে, এটা কলকাতা না যে তিনশ' টাকায় জেসপবার্নে ঢুকে দেড় হাজারে রিটায়ার করলেই কৃতার্থবোধ করবে। এখানে মানুষ একশ' টাকাতে জীবন শুরু করলেও সারা জীবনে দশ-বিশটা চাকরি করে শেষ জীবনে নিজেই একটা ফ্যাক্টরী খুলে বসে।

আমরা স্বপ্নেও তা ভাবতে পারি না।

বোতলের শেষটুকু বিমান জাগে ঢেলে দেয়। সুদীপই বলে, তুই কী আমার বিষয়ে কোন কথা বলেছিস ?

শোন, এবার তাহলে বলি। বিমান জাগে একটা চুমুক দিয়ে শুরু করে, আমাদের ফরিদাবাদ ফ্যাক্টরীর অনেককেই আরো বেশি মাইনে আর সুযোগ-সুবিধে দিয়ে বরোদার নতুন ফ্যাক্টরীতে পাঠানো হয়েছে ও হচ্ছে। ফলে এখানে বেশ কিছু নতুন লোককে নেওয়া হচ্ছে।

ও।

মিঃ অটোয়াল আজ রাত্তিরেই বোম্বে থেকে ফিরবেন। কালই তোকে ওর কাছে নিয়ে যাব আর কালই তুই এ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার পেয়ে যাবি।

সুদীপ শুধু হাসে।

বিমান চাপা হাসি হেসে বলে, কিন্তু শালা বলে রাখছি, মালাকে কিন্তু রেগুলার আমাকে মাছ খাওয়াতে হবে। এই চৌকিদার হতচ্ছাড়া সব ভাল রান্না করতে পারে কিন্তু এত বিশ্রী মাছ রাঁধে····

তুই না বললেও মালা তোকে রেগুলার খাওয়াবে।

বাই দ্য বাই তোকে বলে দিই, দিল্লী-বোম্বের কোথাওই কাজ না দেখে বেশি মাইনে দেয় না। সুতরাং মাস ছয়েক তোকে এই পনেরো শ'তেই কাজ করতে হবে।

তুই যা ভাল বুঝবি, তাই করব।

বিমান হেসে বলল, এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চার্জে তো আমি আছি। তোর কোন চিন্তা নেই। জান-প্রাণ দিয়ে কাজ কর, তারপর সব দায়িত্ব আমার।

পরের দিন টুকটাক কথাবার্তা বলার পরই মিঃ অটোয়াল বললেন, আপনার যখন স্টোর্সের অভিজ্ঞতা আছে আর বিমান রেকমেণ্ড করছে তখন আমার কিছু বলার নেই। তবে আমি সাজেস্ট করব আপনি আজই একবার ফ্যাক্টরীটা দেখে আসুন। সী থিংগস্ ফর ইওরসেলফ।

বিমান বলল, গুড আইডিয়া।

মিঃ অটোয়াল বিমানকে বললেন, তুমি সুদীপ্তবাবুকে ফ্যাক্টরীতে যাবার ব্যবস্থা করে দাও। আমি মিঃ যোশীকে ফোন করে দিচ্ছি।

ঠিক আছে।

তারপর সন্ধ্যের পর তুমি মিঃ সরকারকে নিয়ে আমার ওখানে চলে এসো। উই উইল হ্যাভ ডিনার টুগেদার।

সুদীপ মিঃ যোশীর ঘরে পা দিতেই উনি পরিষ্কার বাংলায় বললেন, আসুন মিঃ সরকার, আসুন। বসুন।

সুদীপ না বসে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

মিঃ যোশী একটু হেসে বলেন, আমার বাংলা শুনে অবাক হচ্ছেন? আমার ভাই কলকাতায় থাকে, আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছি কলকাতায় আর আমি বাংলা জানব না?

মিঃ যোশী চীফ এঞ্জিনিয়ার এ্যাণ্ড ফ্যাক্টরী ম্যানেজার। বেশ বয়স্ক হলেও যেমন প্রাণ প্রাচুর্য তেমনি কর্মশক্তি। উনি নিজে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাবার পর সুদীপকে বললেন, স্টোর্স সম্পর্কে আপনার

যখন অভিজ্ঞতা আছে, তখন চিন্তার কী? তাছাড়া এক মাসে আমি আপনাকে আমাদের মত তৈরি করে নেব। আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

সন্ধ্যের পর বসন্ত বিহারে মিঃ অটোয়ালেব বাড়ি যেতেই উনি সুদীপকে হাসতে হাসতে বললেন, আপনাকে তো মিঃ যোশীর খুব ভাল লেগেছে।

শুনে সুদীপ খুশি হয়। বলে, মিঃ যোশীকে দেখলেই মনে হয়, মানুষটি খুব ভাল।

সেণ্টার টেবিলে হুইস্কীর বোতল, গেলাস, আইস বাকেট, জলের বোতল আগেই রাখা ছিল। মিঃ অটোয়াল তিনটে গেলাসে হুইস্কী ঢালতে ঢালতে বলেন, আই রেসপেক্ট হিম লাইক মাই এলডার ব্রাদার।

বিমান বলল, যোশীজির মত উদার আব কাজ পাগল মানুষ সত্যি বেয়ার।

ড্রিঙ্ক কবার অভ্যাস সুদীপের আদৌ নেই কিন্তু মিঃ অটোয়াল নিজে হাতে গেলাসটা তুলে দিলেন বলে ও হাসি মুখেই তা গ্রহণ করে। তাছাড়া মনে মনে ভাবে, কলকাতার আলিপুব বা সল্টলেক-বাসী কোন ধনী ব্যবসাদার কি তার এক সামান্য কর্মচাবীকে এভাবে আপ্যায়ন করবেন? না, কখনই না।

আরো অনেক কথা ভাবে সুদীপ। বাঙালীর মুখে সমাজতন্ত্র-গণতন্ত্রের বুলি কিন্তু তার রক্তে আভিজাত্য ও অহঙ্কারের বীজ লুকিয়ে আছে। অটোয়াল সাহেবের আন্তরিক ব্যবহারে ও মুগ্ধ হয়ে যায়। নানা বিষয়ে নানা আলোচনার সময় বিমান মিঃ অটোয়ালকে বলল, মিঃ যোশী চাইছেন, সুদীপ দু'পাঁচ দিনের মধ্যেই জয়েন করুক। আমি কী ওকে কালই প্লেনে পাঠিয়ে দেব?

তা দাও কিন্তু সুদীপ্ত তো ওর স্ত্রী আর মালপত্র নিয়ে আসবে।

তা তো বটেই।

ওদের আসারও একটা ব্যবস্থা করে দাও।

কিন্তু ওরা এসে এখন থাকবে কোথায়? গেস্ট হাউসে?

হ্যাঁ, গেস্ট হাউসের দুটো ঘর ওদের ছেড়ে দাও। একটা ঘর গেস্টের জন্য থাকুক। মিঃ অটোয়াল একটু থেমে বলেন, তারপর যদি হঠাৎ দু'তিন জন গেস্ট এসে যান, তাহলে তাদের হোটেলে রাখব।

এদের কাণ্ডকারখানা দেখে সুদীপ তাজ্জব। পরের দিন সকালে সুদীপ ইনিয়ে-বিনিয়ে নৈহাটিতে একটা টেলিফোন করার কথা বলতেই বিমান হেসে বলল, একটা সামান্য ট্রাংককল করার জন্য তুই এভাবে বলছিস কেন?

বিমান সঙ্গে সঙ্গে আর্জেন্ট কল বুক করল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই লাইন পাওয়া গেল। সব শুনে অভীক মহা খুশি। বলল, তোর কোন চিন্তা নেই। আমি মালাকে নিয়ে এয়ারপোর্ট যাব।

সুদীপ বলল, কিন্তু অত রাত্রে তুই ফিরবি কিভাবে?

যদি ফিরতে না পারি তাহলে কলকাতায় তোদের বাড়িতেই থেকে যাব।

হ্যাঁ, সেই ভাল।

বিমান নিজে সুদীপকে নিয়ে পালামে গেল। কলকাতা থেকে আসার জন্য ফার্স্ট ক্লাশ ভাড়া সুদীপের হাতে দিয়ে বিমান বলল, কবে কোন ট্রেনে তোরা আসছিস জানলে আমি স্টেশনে থাকব।

প্লেনে ওঠার আগে সুদীপ বিমানকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল, ছোট ভাই আই-আই-টিতে চান্স পেয়েছে কিন্তু কী করে ওর খরচপত্তর চালান হবে, তা ভেবেই মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তুই যে কি উপকার করলি, তা আর কী বলব!

বিমান হাসতে হাসতে বলল, তুই আমার বাল্যবন্ধু না? তাছাড়া এখানে লোকের জরুরী দরকার বলেই তো অটোয়াল সাহেব তোকে নিলেন। এর জন্য এত ধন্যবাদ জানাবার কী আছে?

দমদমে প্লেন থেকে নেমে সুদীপ টার্মিনাল বিল্ডিং-এ ঢুকতেই

আনন্দে-খুশিতে মালা অসংখ্য লোকের সামনেই ওকে জড়িয়ে ধরল।

অভীক বলল, মালা, তুমি তো পরেও ওকে জড়িয়ে ধরার চান্স পাবে, এখন আমাকে একটু জড়াতে দাও।

ওর কথায় ওরা দু'জনেই হাসে।

সেদিন বোসপাড়ার দু'বাড়িতেই আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আশঙ্কা ছিল ব্যানার্জী সাহেবকে নিয়ে কিন্তু তিনিও মহা খুশি হলেন। বললেন, এত ভাল চান্স পেয়েছ আর আমি তোমাকে ছাড়ব না? গো এ্যাহেড এ্যাণ্ড ইউ হ্যাভ মাই গুড উইসেস।

শুধু তাই না। মিঃ ব্যানার্জী পরের দিনই ওদের দু'জনকে নেমন্তন্ন করে খাইয়ে কিছু উপহারও দিলেন। সব শেষে বললেন, যদি কখনও কোন সমস্যা হয়, আমাকে জানাতে দ্বিধা করো না। আই উইল ডু মাই বেস্ট টু হেলপ্ ইউ।

মিসেস ব্যানার্জী বললেন, হাজার হোক আমরা তো ওদের দাদা-বৌদির মত। দ্বিধা করবে কেন?

সুদীপ আর মালা প্রায় একসঙ্গে বলে, সে তো একশ' বার।

সুদীপ এবার বলে, আপনাদের দু'জনের কথা আমরা সারাজীবনেও ভুলতে পারব না।

সবার বাড়িতে নেমন্তন্ন খাবার সময় ছিল না। তাই বেলাদি সবাইকে নেমন্তন্ন করলেন। খুব হৈ-চৈ হল। লিপি বলল, এবার পুজোর ছুটিতে আমরা ডেফিনিটলি দিল্লী আসছি।

সুদীপ বলল, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।

মালা বলল, বেলাদি, দাদা তো দু'চার মাস অন্তরই দিল্লী যান। এবার তুমিও দাদার সঙ্গে চলে এসো।

বিবেকদা হাসতে হাসতে বললেন, ওকে নিয়ে গেলে আমার আর কাজকর্ম হবে না। শুধু জনপথের দোকানগুলোতেই ঘুরে বেড়াতে হবে।

মালা সঙ্গে সঙ্গে বলে, আপনি আপনার কাজ করবেন, আমি বেলাদিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াব।

সে দায়িত্ব তুমি নিলে মাঝে-সাঝে নিয়ে যেতে পারি।

মিত্রাদি-বিভাসদাও দিল্লী আসবেন বলে কথা দিলেন।

বোসপাড়াতেও হৈ চৈ করে দুটো দিন কেটে গেল। সব চাইতে খুশি প্রদীপ। দাদা দিল্লী থেকে সোজা ওকে টাকা পাঠিয়ে দেবে। এখন আর ওকে দেখে কে! খুশি দু'জনের বাবা-মা।

হাওড়া স্টেশনে বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানও মন্দ হল না। দু'বাড়ির লোকজন ছাড়াও আরও কয়েকজন এসেছেন। অভীক, প্রদীপ আর সমর মালপত্র তুলে দেয়, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। নানাজনের নানা কথাবার্তার মাঝে অভীক একবার ওদের দুজনকে একটু দূরে নিয়ে সুদীপ আর মালার দুটো হাত ধরে বলে, তোরা আমাকে ভুলে যাস না।

সুদীপ বলল, তুই কি পাগল হয়েছিস? তোকে ভুলে যাব?

মালা বলল, আমাদের কি মন বলে কিছু নেই?

অভীক একটু ম্লান হেসে বলে, নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়-বন্ধুত্ব হলে অনেকে তো পুরনো বন্ধুদের ভুলে যায়!

সুদীপ ওকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল, ওসব পাগলামী চিন্তা-ভাবনা মাথা থেকে সরিয়ে দে। আমরা একটু গুছিয়ে নিলেই তুই চলে আসবি।

তোরা চাইলে নিশ্চয়ই আসব। ও একটু থেমে বলল, দাদা-বৌদির ছেলেমেয়ে থাকলে হয়তো আমিও দিল্লী চলে যেতাম কিন্তু তা তো হবার নয়।

আস্তে আস্তে ট্রেন ছাড়ার সময় এগিয়ে আসে। সুদীপ্ত আর মালা গুরুজনদের প্রণাম করে, প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। ট্রেনে ওঠে। গার্ডের হুইসেল শোনা যায়। ডিল্যুক্স এক্সপ্রেস নিঃশব্দে দিল্লীর পথে চলতে শুরু করে।

ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে ওরা হাত নাড়ে কিন্তু একটু পরেই পরম প্রিয়জনদের মুখগুলোও অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে যায়। ট্রেনটা একটু মোড় ঘুরতেই ওরা সবাই দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। সুদীপের হঠাৎ মনে হয়, জীবনটাও কী একটা চলমান ট্রেন! অনেক কাছের মানুষ আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে?

॥ ছয় ॥

নিউ দিল্লী স্টেশনে বিমান ওদের অভ্যর্থনা করল। ড্রাইভার আর বেয়ারা মালপত্র নামিয়ে কিছু কুলির মাথায় দিয়ে আর কিছু নিজেরাই হাতে তুলে নিল। বিমান ওদের তুজনকে নিয়ে পিছনে বসল। মালপত্র ডিকি আর ওপরের ক্যারিয়ারে রাখাব পর বেয়ারাকে পাশে বসিয়ে ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। বিমান সামনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, সামান গুনতি কবকে উঠায়া ?

ড্রাইভার বলল, জী সাব !

এবার বিমান পাশে দৃষ্টি ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, ট্রেনে তোদের কোনো কষ্ট হয়নি তো ?

ওরা তুজনে একসঙ্গে উত্তর দেয়, না, না।

গাড়ি কনট প্লেস, কার্জন রোড, ইণ্ডিয়া গেট ছাড়িয়ে ওয়েলেসলী রোডে ঢোকে। মালা মুগ্ধ বিস্ময়ে চারদিক তাকিয়ে দেখে। ওবেরয় ইণ্টার-কন্টিনেণ্ট্যাল হোটেল দেখে অবাক হয়ে যায়। মনে মনে ভাবে, কলকাতার গ্রাণ্ড-গ্রেট ইস্টার্ন বা পার্ক-হিন্দুস্থান হোটেল তো এব কাছে কিছুই না। ভাবতে ভাবতেই গাড়ি জংপুরা-ডিফেন্স কলোনী-লাজপত নগরের পাশ দিয়ে ছুটে চলে। ইস্! কী সুন্দর বাড়িগুলো ! আর কি সুন্দর বাগান বাড়িগুলোর সামনে ! মনে মনেই কলকাতার বাড়িগুলোর সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে হোঁচট খায়। ঠিক এমন একটা সুন্দর দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই চৌকিদার দৌড়ে এসে সেলাম করে গাড়ির দরজা খুলে দেয়।

বিমান বলে, সব সামান ওপরে নিয়ে যাও। আর আমার ঘরে তিনটে কফি পাঠাও। এবার ও সুদীপকে বলে, চল, আমার ঘরে বসি।

ওরা তুজনে ওর পিছনে পিছনে ঘরে ঢোকে। ঘরদোর আসবাবপত্র দেখে মালা অবাক না হয়ে পারে না। বিমান বলল, যাও মালা, বাথরুম থেকে একটু হাত-মুখ ধুয়ে এসো।

বিমান নিজেই বাথরুমের দরজা খুলে দেয়। মালা ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সামনের বিরাট আয়নায় নিজেকে দেখেই হেসে ওঠে। মনে মনে একবার বোসপাড়ার বাড়ির বাথরুমের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়েও পারে না। দুটোর মধ্যে কোনো তুলনাই চলে না। এটা বাড়ি, নাকি পাঁচতারা হোটেল!

কফি খাবার সময় মালা বিমানের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, তুমি বেশ ভালই আছো।

তোমরাও ভাল থাকবে।

সুদীপ বলে, এখানকার লাইফের সঙ্গে কলকাতার লাইফের কোনো তুলনাই হয় না।

বিমান সঙ্গে সঙ্গে বলে, এখানকার লোকজন যা পরিশ্রম করে, তা কি কলকাতার লোক করবে?

ওরা চুপ।

বিমান বলে যায়, এখানে অফিস ফাঁকি দিয়ে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল বা গাভাসকারের খেলা দেখা যায় না।

মালা প্রশ্ন করে, কেন, এখানকার লোকজন কী খেলা দেখে না?

দেখবে না কেন? তবে অফিস ফাঁকি দিয়ে না, ছুটি নিয়ে খেলা দেখতে হবে। বিমান একটু হেসে বলে, কলকাতা থেকে এখানে আসার পর প্রথম কয়েক মাস যে আমার কি কষ্ট হয়েছে, সে আর কি বলব!

ব্যানার্জী সাহেবের ওখানেও কাজে ফাঁকি-টাকি দেওয়া একদম চলতো না।

তাহলেও এখানে তোর এ্যাডজাস্ট করতে একটুও অসুবিধে হবে না।

না, বিমান আর গল্প করে না। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি অফিস যাচ্ছি। দুটো-আড়াইটের মধ্যে চলে আসব। তোরা স্নান-টান করে বিশ্রাম কর। তারপর একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করব।

বিমান সুইচ টিপতেই বেয়ারা ছুটে আসে, জী সাব!

সাহেব-মেমসাহেবকে ওপরে নিয়ে ওদের ঘর-টর দেখিয়ে দাও। আর ঠিক মতো দেখাশুনো করো।

জরুর সাব !

বিমান ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বলে, আমরা একসঙ্গেই লাঞ্চ করব !

ঠিক হ্যায় সাব !

ওপরের ঘরদোর-বাথরুম জিনিসপত্র দেখিয়ে বেয়ারা দরজা বন্ধ করে চলে যেতেই মালা দু'হাত দিয়ে সুদীপেব গলা জড়িয়ে বলে, দারুণ চাকরি জোগাড় কবেছ।

সুদীপ একটু হেসে বলে, আমি যোগাড় করিনি, বিমান দিয়েছে।

সত্যি, বিমানদা যে উপকার করলেন, তা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না।

ওকে কিন্তু রোজ মাছ খাওয়াতে ভুলে যেও না।

না, না, ভুলব কেন ? মালা একটু থেমে বলে, বিমানদা যে তোমাকে এত ভালবাসে, তা আগে বুঝতে পারিনি।

শুধু আমাকে কেন, তোমাকেও ও খুব ভালবাসে। সুদীপ একটু থেমে বলে, হাজার হোক ছোটবেলাব বন্ধু ! তোমাকেও তো জন্ম থেকেই দেখছে !

মালা একটু হেসে বলে, বিমানদা যে আমাকেও খুব ভালবাসে, তাও জানি। বর্ষাকালে স্কুল-কলেজ থেকে আসার সময় বিমানদা কতদিন আমাকে ছাতি দিয়ে নিজে ভিজতে ভিজতে এসেছে ! আমি কতবার ওকে ছাতির তলায় আসতে বলতাম কিন্তু পাছে কেউ কিছু মনে করে তাই ও কোনো দিন আসতো না।

সুদীপ হেসে বলল, আগে ও ভীষণ লাজুক ছিল।

সুটকেশ খুলে জামা-কাপড় বের করতে করতেই মালা প্রশ্ন করে, আচ্ছা দীপ, তুমি কখনো এইরকম বাড়িতে থেকেছ ? আমি তো কোনো জন্মেও থাকি নি।

না, এইরকম বাড়িতে আর কোথায় থাকলাম। ও একটু থেমে বলে, তবে এটা তো কোম্পানীর গেস্ট হাউস। আমরা তো এখানে

বেশীদিন থাকব না।

এখানে আমরা কতদিন থাকব ?

ঠিক জানি না, বোধহয় মাসখানেক।

এক মাস এইরকম বাড়িতে থাকাই কি চাট্টিখানি কথা !

জিনিসপত্র সাজিয়ে-গুছিয়ে জামা কাপড় ওয়াড্রবে রেখে বাথরুম পর্ব শেষ করতে করতেই দু'টো বেজে যায়। বেয়ারা এসে খবর দিল, ম্যানেজার সাব ফোন করে বলেছেন, আধঘণ্টার মধ্যেই আসছেন।

ঠিক হ্যায়।

পাঁচ-সাত মিনিট পরে আবার দরজায় নক্। সুদীপ দরজা খুলতেই দেখে বেয়ারার হাতে টেলিফোন।

বেয়ারা ঘরের মধ্যে প্ল্যাগে টেলিফোন লাগিয়ে দেয়। সুদীপ রিসিভার কানে তুলে নিয়েই বলে, হ্যালো !

জাস্ট এ মিনিট স্যার ! মিঃ অটোয়াল কথা বলবেন।

ইয়েস সুদীপ্তবাবু !

হ্যাঁ বলুন স্যার !

ট্রেন ঠিক টাইমে এসেছিল ?

হ্যাঁ স্যার।

এখানে সব এ্যারেঞ্জমেণ্ট ঠিক আছে তো ?

হ্যাঁ স্যার, সব ঠিক আছে।

আজ রাত্রে আপনি আর আপনার স্ত্রী আমার ওখানে আসবেন। খাওয়া-দাওয়া করতে করতে একটু গল্পগুজব করা যাবে।

নিশ্চয়ই আসব।

বেশী দেরি করবেন না, আমি বিমানকে বলেছি, সাড়ে সাতটার মধ্যে পৌঁছতে।

ঠিক আছে স্যার !

আচ্ছা নমস্কার ! সী ইউ ইন দ্য ইভনিং।

হ্যাঁ স্যার, নমস্কার !

রিসিভার নামিয়ে রেখেই সুদীপ একগাল হাসি হেসে বলে,

অটোয়াল সাহেব রাত্রে আমাদের খেতে বললেন।

অত বড়লোকের বাড়িতে যেতে আমার ভীষণ ভয় করে।

কেন? ভয় কিসের?

ওদের চালচলন আদব-কায়দা····

ওরা বড়লোক হলেও ভীষণ ভালো মানুষ! তুমি ওদের ব্যবহার দেখলে অবাক হয়ে যাবে।

তবুও····

বেয়ারা এসে খবর দেয়, ম্যানেজার সাব এসে গেছেন। আপনারা কী নীচে যাবেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসছি।

ওরা দু'জনে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বেয়ারা ট্রে করে দু'টো বীয়ার আর দুটো জাগ নিয়ে হাজির হয়। বিমান মালার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি একটু জিন খাবে তো?

আমরা কি এইসব খেতে অভ্যস্থ? মালা হেসে জবাব দেয়।

বিমান জাগে বীয়ার ঢালতে ঢালতেই বলে, আমরা বিয়ার খাব আর তুমি চুপচাপ বসে থাকবে, তাই কী হয়?

তাতে কিছু হবে না।

ছোট্ট একটা জিন খাও, কিচ্ছু হবে না।

বেয়ারা নিজেই একটা ছোট জিন তৈরি করে আনে। বিমান বীয়ারের জাগ তুলে বলে, ফর ইওর হ্যাপিনেস! চিয়ার্স!

সুদীপও বলে, চিয়ার্স!

ওদের দু'জনের দেখাদেখি মালাও গেলাস তুলে হাসতে হাসতে বলে, চিয়ার্স!

এক চুমুক দিয়ে জাগটা সেন্টার টেবিলে রেখেই বিমান বলে, বা! হ্যাটস লাইক এ গুড মডার্ন গার্ল!

মালা হেসে বলে, পুরীতে গিয়ে অভীকদার পাল্লায় পড়ে এটুকু শিখেছি।

আবার অভীকদাকে কোথায় জোগাড় করলে?

বিমানের কথায় ওরা দু'জনেই হেসে ওঠে। তারপর মালা বলে, অভীকদা ওর বন্ধু হলেও ঠিক আমার দাদার মত।

বিমান হাসতে হাসতে বলে, নাটকের প্রথমদিকে সবাই দাদা থাকে। তারপর কে যে কখন সুদীপদা থেকে দীপ হয়ে যাবে, তার কি ঠিক আছে?

হাসে ওরা দু'জনেও।

মালা বলে, তোমাব কথাবার্তাব ধরন ঠিক সেই আগের মতই আছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, একটু লাজুক হলেও তুমি বরাবরই ভারী মজার মজার কথা বলতে।

ওরা দুই বন্ধু বীয়ারেব জাগে চুমুক দেয়। মালাও আরো একটু জিন গলায় ঢেলে দেয়। বিমান জিজ্ঞেস করে, কী মালা, জীন খেতে খারাপ লাগছে?

মালা হেসে বলে, না।

জিন এ্যাণ্ড লাইম খেতে ভালই লাগে। তাছাড়া দুটো-একটা জিন'এ নেশা হয় না।

এবাব বিমান সুদীপকে জিজ্ঞেস করে, হ্যারে, কবে জয়েন করবি? কাল না পরশু?

তুই বল।

আজ তো বিশ্রামই করছিস। কালই জয়েন্ন কর। শুধু শুধু একদিনের মাইনে লস করবি কেন?

মালা বলে, তা তো বটেই।

সুদীপ বলল, ঠিক আছে।

বিমান বলে, তাছাড়া তুই আজ এসেই কাল জয়েন করলে অটোয়াল সাহেব বা যোশীজী খুব খুশী হবেন। সবসময় মনে রাখিস, তুই ওদের খুশি রাখলে ওরাও তোকে খুশি করবেন।

ওরা দু'জনেই মন দিয়ে ওর কথা শোনে।

বিমান বলে যায়, ফ্যাক্টরীর টাইমিং হচ্ছে আটটা থেকে চারটে। তবে যোশীজী ছ'টা-সাতটা পর্যন্ত রোজই থাকেন। উনি যতক্ষণ ফ্যাক্টরীতে থাকবেন, তুইও থাকিস। তারপর ওর গাড়িতেই চলে আসিস।

ঠিক আছে।

যোশীজী কাজ পাগল মানুষ। যারা কাজ করতে ভালবাসে তাদের জন্য উনি সবকিছু করতে পারেন। বীয়ারের জাগে আবার একটা চুমুক দিয়ে বিমান বলে, ফ্যাক্টরীর ব্যাপারে যোশীজী যা বলেন, অটোয়াল সাহেব তাই করেন।

যোশীজীকে তো অটোয়াল সাহেবও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন।

শুধু শ্রদ্ধা না, অত্যন্ত বিশ্বাসও করেন।

বেয়ারা আবার দুটো বীয়ারের বোতল নিয়ে ঘরে ঢুকতেই বিমান মালার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, মাতাল হয়ে যাও নি তো?

মালা হাসে।

আর একটা জিন খাবে তো?

সুদীপ বলল, আরে, খাও, খাও। এমন আনন্দের দিন তো এর আগে আসে নি।

বেয়ারা আবার একটা জিন দিয়ে যায়। আবার কথাবার্তা শুরু হয়। মালা জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বিমানদা, তুমি কি রোজ দুপুরেই দু'বোতল বীয়ার খাও?

যদি হাতে সময় থাকে তাহলে একটা বীয়ার খেয়ে লাঞ্চ খাই, তবে সপ্তাহের পাঁচদিনই সে সময় হয় না।

আজকে দু'বোতল খাচ্ছেন কেন?

বিমান হাসতে হাসতে বলে, যে মেয়েটা সারা বোসপাড়া আলো করে রাখত, তাকে কাছে পাবার আনন্দে।

মালা হাসে। বলে, তাহলে তো আমার এখানে না থাকাই উচিত। এইটুকু আনন্দ থেকে যদি বঞ্চিত করতে চাও, করতে পারো।

হাসি-ঠাট্টার পর আবার বিমান সুদীপকে বলে, সাতটা দশ-

পনেরোতে মোড়ের মাথায় গিয়ে কোম্পানির বাসে যাবি। লাঞ্চের আগে দু'বার চা দেবে। বারোটায় লাঞ্চ। আবার আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে চা আর কিছু স্ন্যাক্স দেবে। এর জন্য মাইনে থেকে মাসে মাসে একশ' টাকা কেটে নেওয়া হবে।....

মালা বলল, বেশ ভাল ব্যবস্থা!

বিমান বলল, তাছাড়া বহু ফ্যাক্টরীর চাইতে আমরা অনেক ভাল লাঞ্চ দিই।

সুদীপ জিজ্ঞেস করে, যোশীজীর গাড়ীতে আসলে কেউ কিছু মনে করবে না তো?

না, না, কেউ কিচ্ছু মনে করবে না। বিমান একটু বীয়ার গলায় ঢেলে দিয়ে বলে, তোকে কিছু বলতেও হবে না। যোশীজীই তোকে ওর সঙ্গে আসতে বলবেন।

উনি কোথায় থাকেন?

এইতো ডিফেন্স কলোনীতে।

খেতে বসেও কথাবার্তা চলে। মালা জিজ্ঞেস করে, বিমানদা, বাজার কত দূর?

আমাদের এই পাড়াতেই একটা বাজার আছে। তাছাড়া খানিকটা দূরে লাজপত নগরে বিরাট বাজার আছে।

সুদীপ বলল, তোদের চৌকিদার বা বেয়ারা কি আমাদের বাজারটা দেখিয়ে দিতে পারবে?

না, না, ওদের সঙ্গে যেতে হবে না। কাল-পরশু অফিস থেকে এসে আমিই নিয়ে যাব।

সুদীপ মালাকে বলে, ফ্যাক্টরী থেকে ফিরতে আমার তো দেরি হবে। তুমিই কাল বিমানের সঙ্গে বাজার গিয়ে....

তোরা এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? দু'চারদিন যাক, তারপর দেখা যাবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু গল্পগুজব করতে না করতেই মালার ঘুম আসে। বলে, বিমানদা, তোমরা গল্প করো। আমি একটু শুতে যাচ্ছি।

আচ্ছা যাও।

মালা ওপরে চলে যাবার পর ওরাও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেই ঘুমিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যের পর অটোয়াল সাহেবের বাড়ি যাবার জন্য মালা সেজেগুজে ওপর থেকে নেমে আসতেই বিমান চাপা হাসি হেসে বলে, হে নিরুপমা, চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা···হে নিরুপমা, আঁখি যদি আজ করে অপরাধ, করিয়ো ক্ষমা।

সুদীপ হাসে।

গাড়িতে উঠতে উঠতে মালা বলে, ক্ষমা করব কিনা তা এখনই বলতে পারছি না।

বসন্ত বিহারে অটোয়াল সাহেবের বাড়ির ভেতরে গাড়ি ঢুকতেই মালা বলে, এ তো দেখছি কোটিপতির বাড়ি।

বিমান বলল, হ্যাঁ, এই কোটিপতিই নানা কারখানার আঠারো বছর মিস্ত্রীর চাকরি আই মীন মেসিনম্যানের চাকরি করেছেন!

বলেন কী? গাড়ি থেকে নামতে নামতে মালা প্রশ্ন করে।

দিল্লীর নিরানব্বুই ভাগ বড়লোকই জীবনের প্রথমে মিস্ত্রী বা সামান্য দোকানদার ছিলেন।

ইতিমধ্যে সস্ত্রীক অটোয়াল সাহেব এগিয়ে এলেন, আইয়ে, বহিনজী, আইয়ে সুদীপ্তবাবু।

বিমান হাসতে হাসতে বলল, ভাবীজি, আমি আসব না?

না, না, তুমি কী আসবে? তোমাকে তো আমরা চিনি না।

ভাবীজির কথায় সবাই হাসেন।

ভাবীজি ড্রইংরুমে ঢুকতে ঢুকতেই সুদীপের দিকে তাকিয়ে বলেন, সুদীপ ভাইয়া, তোমার স্ত্রী বিউটিফুল না, চার্মিং!

বিমান একবার আড় চোখে মালার দিকে তাকিয়েই বলে, ভাবীজি, মালা ভীষণ অহঙ্কারী মেয়ে। ওর আর প্রশংসা করবেন না।

মিসেস অটোয়াল চাপা হাসি হেসে বলেন, এই ফাজিল ছেলেটা

একদিন আমার কাছে মার খাবে।

ভাবীজি, আপনার হাতের থাপ্পড় খেলে আমি কালই কোম্পানির ডিরেক্টর হয়ে যাব।

লম্বা সোফার একপাশে মালাকে নিয়ে বসতে বসতে মিসেস অটোয়াল স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন, বিমানকে না তাড়ালে কবে যে ও কোম্পানির মালিক হয়ে বসবে, তা তুমি জানতেও পারবে না।

অটোয়াল সাহেব একটু হেসে বলেন, কোম্পানি চালাচ্ছে তো বিমান আর যোশীজী। আমি কাগজপত্রে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হলেও আসলে পি-আর-ও!

মিসেস অটোয়াল উঠে দাঁড়িয়ে মালাকে জিজ্ঞেস করেন, কী খাবে? ওয়াইন নাকি কোল্ড ড্রিঙ্ক।

কোল্ড ড্রিঙ্ক।

ওরা তিনজনে হুইস্কী খেতে খেতে কথাবার্তা বলে। অন্যদিকের সোফায় পাশাপাশি বসে মিসেস অটোয়াল মালার সঙ্গে কথা বলেন। জানতে চান, বাবা-মা ভাইবোন শ্বশুর-শাশুড়ী ইত্যাদির কথা। মালা জিজ্ঞেস করে, আপনার ছেলেমেয়েরা বুঝি বাড়ি নেই?

আমার এক ছেলে আর দুই মেয়ে! ছেলে এয়ারফোর্সে আছে আর মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে।

মেয়েদের কোথায় বিয়ে হয়েছে? দিল্লীতে?

না। বড় মেয়ে-জামাই সিমলায় থাকে। ওরা দুজনেই কলেজে পড়ায়।....

তাই নাকি?

হ্যাঁ। মিসেস অটোয়াল একটু গর্বের হাসি হেসে বলেন, আমার তিন ছেলেমেয়েই লেখাপড়ায় খুব ভাল। অটোয়াল সাহেব তো লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি, তাই উনি সব সময় ওদের বলতেন, তোমরা ভাল করে লেখাপড়া না করলে আমি কোনো দিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না।

মালা চুপ করে ওর কথা শোনে।

উনি বলে যান, ছেলেটা এয়ারফোর্সে ভালই কাজ করছে কিন্তু জেনারেল লাইনে লেখাপড়া করলেও উন্নতি করতো।

আপনার ছোট মেয়ে কোথায় থাকে ?

এই মাস তিনেক আগেই ওর বিয়ে হল। ওরা কানাডায় থাকে।

এখানে শুধু আপনারা দুজনেই।

হ্যাঁ, তবে মাঝে মাঝেই নাতিকে এনে কাছে রাখি।

নাতি মানে বড় মেয়েব ছেলে ?

মিসেস অটোয়াল একগাল হাসি হেসে বলেন, হ্যাঁ। আমাদের বেস্ট ফ্রেণ্ড।

মালা হাসে।

এই সামনের আঠারোই ওর জন্মদিন। মিঃ অটোয়ালকে সেদিন একটা জরুরী কাজে বোম্বে যেতে হবে বলে আমি একাই যাব। আসার সময় শ্রীমানকে সঙ্গে আনব।

একটু থেমে মিসেস অটোয়াল জিজ্ঞেস করেন, তুমি সিমলা গিয়েছ ?

না।

যাবে আমার সঙ্গে সিমলা ? তিন-চারদিনের মধ্যেই ঘুরে আসব।

এইতো এলাম। এখনই কী যেতে পারব ?

মিসেস অটোয়াল সামনের দিকে তাকিয়ে বলেন, সুদীপ্ত ভাইয়া, আমি সামনের সপ্তাহে সিমলায় যাচ্ছি নাতির জন্মদিনে। আমি যদি মালাকে নিয়ে যাই, তোমার কী খুব অসুবিধে হবে ?

না, না, কিচ্ছু অসুবিধে হবে না।

বিমান বলল, যাও মালা, ঘুরে এসো। একটু হেসে বলে, ভাবীজির সঙ্গে গেলে এক পয়সা খরচ নেই। অথচ প্রাণভরে আনন্দ করা যায়।

মালা বিমানকে বলে, তোমার সঙ্গে গেলে খরচা দিতে হবে বলেই তো কোনো দিন যাব না।

আমার সঙ্গে ভাবীজি গেলেও খরচা দিতে হবে।

মিসেস অটোয়াল স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমার এই ম্যানেজার সাহেব এত স্বার্থপর, তা তো জানতাম না।

হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজব খাওয়া-দাওয়া আদর-আপ্যায়নে ওদের দিল্লী-বাসের প্রথম সন্ধ্যাটি বড় আনন্দময় হল।

ফেরার পথে মালা বলল, জানো বিমানদা, আমি এর আগে কোনো শিখ সর্দারজী ফ্যামিলীর সঙ্গে মিশিনি, মেশার সুযোগও হয়নি কিন্তু ওরা যে এত ভাল হয়, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমরা বাঙালীরা বাছবিচার করে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করি বলে কী সারা দুনিয়ার লোকই তাই করবে?

সুদীপ বলে, তোকে ওরা দুজনেই খুব ভালবাসেন।

হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিমান একটু থেমে বলে, তুই যদি বিশ্বাসভঙ্গ না করিস আর নিজের কাজটা ভাল করে করিস, তাহলে তোদেরকেও ওরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসবেন।

॥ সাত ॥

সুদীপের নতুন জীবন শুরু হলো। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে ছ'টার আগেই। এক কাপ চা খেয়েই সুদীপ বাথরুমে যায়। মালা চলে যায় কিচেনে। ওর ব্রেকফাস্ট তৈরি করে। এক একদিন এক একরকম। কোনোদিন লুচি-পরটা-তরকারী, কোনোদিন দুধ-কর্নফ্লেক্স, টোস্ট-ওমলেট। মাঝে মাঝে দুধ-চিড়ে মাখা। সাতটার পাঁচ-সাত মিনিট আগেই রেডি ফর ডিপারচার।

তুমি কী আজও দেরি করে ফিরবে? মালা জানতে চায়।

কেন? কোনো দরকার আছে?

রোজ রোজ বিমানদাকে বাজারে টেনে নিয়ে যাওয়া কী ঠিক?

সুদীপ একটু হেসে বলে, অফিস থেকে আসার পর ও হতভাগার আর কি কাজ? বরং তোমার সঙ্গে বাজারে গেলে দু'এক পেগ কম খাবে।

না না, আজকাল আর বিমানদা অত ড্রিঙ্ক করে না। মালা একটু

থেমে বলে, সারাদিন পাগলের মত পরিশ্রম করার পর সন্ধ্যের পর একলা থাকতো বলেই····

সুদীপ সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলে, তা ঠিক। এখানে তো ওর কোনো বন্ধু নেই।

আমাদের কাছে পেয়ে বিমানদা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে।

সুদীপ হেসে বলে, ওর জন্য তো আমরাও একলাফে স্বর্গসুখ ভোগ করছি।

সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

না, সুদীপ আর দেরি করতে পারে না। বাস ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ে। তবে বেরুতে বেরুতেই মালাকে বলে, বেগম, তুমি কিন্তু বিমানকে একটু দেখাশুনো কোরো।

মালা হেসে বলে, আমি ওকে কী দেখাশুনো করবো? বিমানদাই আমার দেখাশুনো করে।

সুদীপ হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়।

ফ্যাক্টরীতে সারাটা দিনই ওর ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। বিরাট ফ্যাক্টরী। সারা বছরে আট কোটি টাকার মেসিনপত্র তৈরি হয়। এই ফ্যাক্টরী চালাবার জন্য প্রায় আড়াই কোটি-তিন কোটি টাকার মালপত্র কেনা হয়। এ ছাড়া বরোদা ফ্যাক্টরীর জন্য প্রায় এক কোটি টাকার জিনিসপত্র এখানে কেনা হয়। কী কেনা হয় না? আলপিন-জেন্টস ক্লীপ-সাবান-তোয়ালে-কটন ওয়েস্ট-কাগজপত্র-টাইপ-রাইটারের রিবন ইত্যাদি থেকে শুরু করে অর্ধেক ফিনিশ করা মেসিন পার্টস পর্যন্ত। আরো কত কি! এক কথায় এলাহি ব্যাপার। কুলি-কেরানী ও দু'জন এ্যাকাউন্ট এ্যাসিসট্যান্ট নিয়ে স্টোর্সের মোট কর্মচারী সংখ্যা পনেরো। এদের ওপর স্টোর্স অফিসার সুদীপ নিজে।

এই ফ্যাক্টরীর তৈরি মেসিনপত্র নানা জায়গায় পাঠাবার জন্য যে ডেসপ্যাচ সেক্সন আছে, তার দায়িত্বও সুদীপের।

জিনিসপত্র ঠিকমত কেনাকাটা করা, তাদের ঠিকমত সাজিয়ে রাখা,

প্রত্যেকটি জিনিসের হিসেব রাখা, যে ডিপার্টমেণ্ট যখন যা চাইবে তখনই তা সাপ্লাই দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কত কাজ, কত ঝামেলা! সারাদিনে সুদীপ নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পায় না। তবে এই ব্যস্ততা ও দায়িত্ব সত্ত্বেও আনন্দ আছে। তার প্রধান কারণ যোশীজী।

বিচিত্র মানুষ এই যোশীজী। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে জাহাজে দেশে ফেরার সময় টাটা কোম্পানীর এক ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ ও তারই অনুরোধে উনি বোম্বেতে জাহাজ থেকে নেমে সোজা চলে যান জামসেদপুরে। জামসেদপুর থেকে রিটায়ার করার পর এক পুরনো সহকর্মীর অনুরোধে চলে আসেন ফরিদাবাদ। সেখানে কাজ করে আনন্দ পান না বলে মাত্র এক হাজার টাকা মাইনেতে অটোয়াল সাহেবের নতুন ফ্যাক্টরীতে চলে আসেন। এখন উনি অটোয়াল সাহেবের ফ্রেণ্ড-গাইড এ্যাণ্ড ফিলজফার। মাইনে পান সাড়ে সাত হাজার। এ ছাড়া বাড়ি-গাড়ি ইত্যাদি তো আছেই। মিঃ অটোয়াল এখন সবার সামনেই বলেন, আমার ফ্যাক্টরী যে এত বড় হয়েছে, শ'ছয়েক লোকের পরিবার যে ভালভাবে খেয়ে-পরে দিন কাটাচ্ছে আর আমি যে সম্মান প্রতিপত্তি ঐশ্বর্য ভোগ করছি, তার মূলে আছেন যোশীজী।

শুধু অটোয়াল সাহেব না, ফ্যাক্টরীর সবাই ওকে শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন। এইত বছর দুয়েক আগে যখন ফরিদাবাদের সমস্ত কারখানায় ধর্মঘট শুরু হলো, তখন এই কারখানার কাজ একদিনের জন্যও বন্ধ হয় নি। এই ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘট হবে কেন? কারুর তো কোনো অভিযোগ নেই। ধর্মঘটে সামিল না হলেও এই ফ্যাক্টরীর সমস্ত শ্রমিক ও কর্মীদের তরফ থেকে ধর্মঘটী শ্রমিকদের ফাণ্ডে পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়। ফরিদাবাদের শ্রমিকরা তো অটোয়াল সাহেবের কারখানার নাম দিয়েছে 'ফরিদাবাদ কা টাটা কোম্পানী'।

একটা হাফ্ প্যাণ্ট-টি সার্ট পরে যোশীজী নিজে গাড়ি চালিয়ে ফ্যাক্টরী আসেন ঠিক পৌনে আটটায়। দশ-এগার ঘণ্টার আগে

কখনই ফ্যাক্টরী ছাড়েন না। কোনোদিন কেউ কিছু বললেই উনি হাসতে হাসতে বলেন, আমার স্ত্রীর যৌবন যদি ফিরিয়ে দিতে পারো, তাহলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারি। এখন তো ও আমাকে আর প্রেম নিবেদন করে না, যতক্ষণ কাছে পায় ততক্ষণই ব্লাড প্রেসার-ব্লাড সুগাব আর আর্থারাইটিসের ব্যথার কথা শোনায়।

সুদীপ যেদিন জয়েন করে সেইদিনই যোশীজী ওকে বলেছেন, সুদীপ, ইউ আর ইয়াংগাব দ্যান মাই সন। আমি তোমাকে আপনি বলব না কিন্তু।

সুদীপ হাসিমুখে বলেছে, আপনি স্বচ্ছন্দে আমাকে তুমি বলবেন। যোশীজী কাজকর্ম সম্পর্কেও অনেক কথা বলেছেন। সব শেষে বলেছেন, দেখ সুদীপ, একটা কথা কখনই ভুলবে না। কাউকে এক নয়া পয়সা কম মাইনে বা বোনাস দেওয়া যাবে না, ইলেকট্রিসিটি খরচ কমানো সম্ভব নয়, গভর্নমেন্টের এক্সাইজ বা অন্যান্য ট্যাক্স আমরা কম দিয়ে খরচ কমাতে পারি না। সাশ্রয় করার মাত্র দু'টি উপায ; একটি হচ্ছে, একটু কম পয়সা দিয়ে ঠিক জিনিসপত্র কেনা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ওয়েস্টেজ বা ড্যামেজ কম করা।

সুদীপ চুপ করে ওর কথা শোনে।

টুলি-ফলে যান, আমরা বাজে 'ব' মেটিরিয়্যাল কিনব না কিন্তু তোমাকে সব সময় চেষ্টা করতে হবে একটু কম দামে কেনার। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ইউ মাস্ট মেক সাপ্লায়ার্স হ্যাপি!

কাজকর্ম বুঝে নিতে কিছুদিন সময় লাগলেও এখন আর কোনো অসুবিধে হয় না! ব্যানার্জী সাহেবের ফ্যাক্টরীর চাইতে এখানে অনেক বেশী দায়িত্ব, পরিশ্রমও বেশী। তাছাড়া থাকতেও হয় অনেকক্ষণ। তবে তার জন্য ওর কোনো দুঃখ নেই। বরং খুশি। কলকাতা-আসানসোল-কানপুরের লরীগুলো সন্ধ্যের আগে আসে না। তাড়াতাড়ি মালপত্র নামিয়ে ওদের ছেড়ে না দিলে সাপ্লায়ারদের পাঁচশো-সাতশো-হাজার টাকার ক্ষতি। রোজ সন্ধ্যের পর একটা না একটা মাল

বোঝাই লরী আসবেই। কোনো কোনো দিন দু'তিনটে লরী পর পর এসে হাজির হয়। আবার কখনো কখনো তিন চারদিন পর পর কোনো লরী আসে না। তবে মাসে গড়ে-সড়ে শত খানেক লরী আসবেই। কুলিদের ওভার-টাইম দিয়ে সুদীপ নিজে তদারক করে মালপত্র নামিয়ে স্টোর্সে রেখে দেয়। সাপ্লায়াররাও অবুঝ না। চটপট লরী ছেড়ে দিলেই এক একটা খাম পাওয়া যায়। প্রথমদিন সুদীপ একটু ভয়ই পেয়েছিল। তারপর বিমানকে বলতেই ও হো হো করে হেসে উঠেছিল।

তুই হাসছিস? যদি যোশীজী বা অটোয়াল সাহেবের কানে কথাটা যায়, তাহলে····

বিমান বলেছিল, সাপ্লায়াররা যদি তোকে ঘুষ দিয়ে খারাপ বা কম মাল সাপ্লাই দেয়, তাহলে যোশীজী বা অটোয়াল সাহেব তোকে ছেড়ে দেবেন না কিন্তু নিছক তাড়াতাড়ি মাল নামিয়ে লরী ছেড়ে দেবার জন্য ওরা খুশি হয়ে যা দিচ্ছে, তা নিতে তোর ভয় কীসের?

এর থেকে কাউকে কিছু শেয়ার দেব কী?

না, না, কাউকে কিছু দিতেও হবে না, বলতেও হবে না। বিমান একটু থেমে বলে, দেওয়ালী-দশহরার সময় [illegible] সাপ্লায়ারই ফ্যাক্টরীর অনেককেই কিছু কিছু দেয়। স্টোর্সের এক একজন [illegible] দেড় হাজার-দু'হাজার পেয়ে যায়।

সুদীপ হাসতে হাসতে বলে, হ্যাঁরে, এভাবে যদি মাসে মাসে দু'তিন হাজার টাকা পকেটে আসে, তাহলে তো আমি রাজা হয়ে যাব।

আজে-বাজে কাউকে রাজা না করে তোকে রাজা করব বলেই তো এখানে টেনে এনেছি।

সুদীপ ওর দুটো হাত চেপে ধরে বলে, রিয়েলী বিমান, আই এ্যাম সো গ্রেটফুল টু ইউ!

ন্যাকামী না করে তোর বউকে বলিস, আমাকে একটু আদর-যত্ন করে খাওয়াতে।

ও তোকে যত্ন না করলে ডিভোর্স করে দেব না! সুদীপ হাসতে হাসতেই বলে।

মালার বাবা স্ট্র্যাণ্ড রোডের একটা অফিসে সামান্য চাকরি করেন। এখন বোধহয় সাড়ে আট শ' টাকা মাইনে পান। শুরু করেছিলেন, শত খানেক টাকায়। স্বচ্ছলতা কাকে বলে, তা মালা জীবনে দেখেনি কিন্তু মনে মনে বরাবরই স্বপ্ন দেখেছে বড়লোক হবার। একটু ভাল সাজ-পোষাক করা, ভাল খাওয়া-দাওয়া, মাঝে মাঝে একটু বড় হোটেল-রেস্তোঁরায় যাওয়া আর একটু আরামে-আয়েসে থাকার প্রতি ওর বড় লোভ। বড় দুর্বলতা।

বিয়ের পর পরই দাদা-বৌদির কৃপায় লক্ষ্ণৌ নৈনিতালে বেড়াতে গিয়ে কয়েক দিনের জন্য সেই স্বাদ সামান্য একটু উপভোগ করেই বড় ভাল লেগেছিল। কল্যাণীতে সব সময় মনে হতো, কবে লিপির মত সুন্দর ঘরদোর হবে, কবে বেলাদির মত সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরবে। আরো কত কি! কোনদিন ভাবতে পারেনি, হঠাৎ বিমানদার কৃপায় সেই স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠবে।

কী মালা, আজকে একটু জিন খাবে নাকি?

তুমি বললে নিশ্চয়ই খাব। মালা একটু হেসে বলে, কেন, যেদিন দিল্লী এসে পৌছই, সেদিন কী জিন খাইনি?

বিমান ওর গাল টিপে আদর করে বলে, ইউ আর এ ভেরি সুইট নাইস গার্ল!

তুমি তো আমার চাইতে হাজার গুণ ভাল।

হাজার গুণ ভাল? দুটো গেলাসে জিন ঢালতে ঢালতেই বিমান মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে বলে।

এক'শ বার।

কেন?

তুমি কী দারুণ হ্যাণ্ডসাম, স্মার্ট, এই বয়সেই কত ভাল চাকরি

করছ, তোমার কত সম্মান প্রতিপত্তি····

জিনের গেলাসটা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলে, আর কিছু না ?

তুমি কত প্রাণখোলা দিলদরিয়া ! সুদীপের মত ঘরকুনো না !

দু'জনে জিনের গেলাসে চুমুক দেয়।

চিয়ার্স।

চিয়ার্স !

জিনের গেলাসে প্রথম চুমুক দিয়েই বিমান বলে, সত্যি সুদীপ অফিস আর বাড়ি ছাড়া আর কিছু চেনে না !

অন্যদিন না হয় টায়ার্ড থাকে কিন্তু রবিবারেও ওকে টেনে বের করা যায় না। মালা একটু থেমে বলে, তুমি না থাকলে যে আমি কি করে সংসার করতাম, তা ভেবে পাই না।

বিমান হেসে বলে, তবে আমার পাল্লায় পড়ে ও হতভাগা বেশ ড্রিঙ্ক করতে শিখেছে।

মালা হেসে বলে, ওর মত ভীতু লোক যে কোনদিন তিন-চার পেগ হুইস্কী খাবে, তা আমি ভাবতেও পারিনি।

চার পেগ আবার কবে খেয়েছে ? সেদিন দেখলে না, তিন পেগ খাবার পরই ও আমার এখানে ঘুমিয়ে পড়ল !

একটা রাউণ্ড শেষ হবার পর দ্বিতীয় রাউণ্ড শুরু হয়।

বিমান বলে, সামনের শনিবার রাত্রে যেভাবেই হোক সুদীপকে টেনে নিয়ে যাব বাদখালে।

ঐ যেখানে খুব সুন্দর লেক আছে বলছিলে ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেরি বিউটিফুল প্লেস। বিমান হাসতে হাসতে বলে, অলসো ভেরি রোমান্টিক প্লেস !

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

কখন ফিরব ?

রবিবার বিকেল-সন্ধ্যে-রাত্রে। বিমান একটু ভেবে বলে, তেমন জমে গেলে সোমবার সকালে সুদীপ ওখান থেকেই ফ্যাক্টরী চলে যাবে

আর....

ওখান থেকে ফরিদাবাদ কত দূর ?

খুব কাছে। গাড়িতে দশ মিনিট !

ব্যস !

হ্যাঁ, তবে কি !

মালা বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন। ওখানে দু'রাতই থাকব।

কিন্তু তুমি ওকে রাজী করাবে।

আমি নিশ্চয়ই বলব তবে তুমি বললে ও কিছুতেই না বলতে পাববে না।

বিমান আবার একটু ভেবে বলে, তাহলে তুমি কিছু বল না, আমিই ওকে বলব।

হ্যাঁ, সেই ভাল।

সুদীপ যে এক কথায় রাজী হবে, তা ওরা ভাবতে পারেনি। ও বিমানকে বলল, কিন্তু একটা শর্ত আছে ?

কী আবার শর্ত ?

তুই সব এ্যারেঞ্জমেণ্ট করবি কিন্তু আই উইল বী দ্য হোস্ট !

মালা বলে, ঠিক বলেছ।

বিমান একটু হেসে বলে, আমি রাজী তবে আমারও একটা শর্ত আছে।

ওরা দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে বলে, কী শর্ত ?

পরের শনি-রবিবার আমি হোস্ট।

সুদীপ হেসে বলে, এগ্রিড !

আলাপ-আলোচনা করে ঠিক হল, শনিবার চারটে-সাড়ে চারটের মধ্যে মালাকে নিয়ে বিমান বাদখাল পৌছবে, সুদীপও মোটামুটি পাঁচটা নাগাদ ফ্যাক্টরী থেকে ওখানে এসে যাবে। বিমান বলল, আমি অফিসের গাড়িটা নিয়ে যাব, যদি দরকার হয়, তাহলে আমি তোকে ফ্যাক্টরী থেকে তুলে নিয়ে বাদখাল যাব।

সুদীপ বলল, যোশীজী ছাড়াও তো অনেকে নিজের গাড়িতেই

ফ্যাক্টরী যায়। কেউ না কেউ আমাকে ঠিকই পৌঁছে দেবেন। তোকে আর আসতে হবে না।

তুই তিনটের মধ্যে আমাকে বা মালাকে একটা ফোন করে দিবি।

ঠিক আছে।

রাত্রে শোবার পর মালা বলে, বিমানদা একটু আমুদে স্ফূর্তিবাজ আছে। ওর জন্য মাঝে মাঝেই এইরকম প্রোগ্রাম করতে হবে।

সে তো একশ' বার।

আজ কোন লরী এসেছে?

হ্যাঁ দুটো।

কত হল?

চার শ'।

লরীগুলো কী কলকাতা থেকে এল?

না, আসানসোল-দুর্গাপুর থেকে।

মালা সুদীপকে জড়িয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে, কানপুর-টানপুরের লরী এলে একশ' করে দেয়, তাই না?

হ্যাঁ।

ফ্যাক্টরীতে আর কেউ এই ধরনের টাকা পায়?

না, আর কে পাবে।

বিমানদা তোমাকে ভাল চাকরি জুটিয়ে দিয়েছে।

সে তো একশ'বার। সুদীপ একটু থেমে বলে, ওর খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর রাখছ তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। মালা একটু থেমে বলে, আমাদের দুজনেরই কিছু জামা-কাপড় কেনা দরকার। ভাল শাড়ি-টাড়ি তো আমাদের বিশেষ নেই।

তোমাকে কিনতে আমি বারণ করেছি? তবে যখন তোমার শাড়ি কিনবে, তখন বাবা-মা আর মাসীমা-মেসোমশাইয়ের জন্যও কাপড়-চোপড় কিনো।

আমিও তাই ভাবছিলাম।

তাছাড়া বিমানকেও একটা স্যুট দেব।

তাহলে তো খুব ভাল হয়।

দেখতে দেখতে শনিবার এসে যায়। সুদীপ বেরুবার সময় মালা আবার ওকে মনে করিয়ে দেয়, তোমাকে ফ্যাক্টরী থেকে তুলে নিতে হবে কিনা, তা তিনটের মধ্যে জানিয়ে দিও।

তিনটের আগেই খবর দেব!

বিমান দুটো নাগাদ অফিস থেকে ফিরতেই মালা বলে, দীপ একটু আগেই ফোন করে বলল, ও পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবে। তোমাকে আর ফরিদাবাদ যেতে হবে না।

ভেরি গুড!

আমরা কখন বেরুব?

গোটাচারেক নাগাদ।

সেই ভাল। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করা যাবে।

খেতে বসে মালা জিজ্ঞেস করে, উধম সিং কী আমাদের ওখানে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে ফেরত আসবে?

না, না, ওকে নেব কেন? পরশু অফিসের আগেই তো আমি এসে যাব।

হ্যাঁ সেই ভাল। ইচ্ছে করলে কাল আমরা একটু ঘোরাঘুরি করতে পারব।

বিমান [illegible] গেলে আর তোমার বাইরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করবে না।

এত ভাল জায়গা?

একটু পরেই তো দেখতে পাবে।

সত্যি বাদখাল দেখে মালা মুগ্ধ হয়ে যায়। কী সুন্দর লেক! কত সুন্দর গাছপালা! ছোট্ট একটা পাহাড়ের মত উঁচুতে রেস্তোরাঁ! তাছাড়া কটেজগুলো দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়।

বিমান গাড়িটা পার্ক করে লেকের পাড়ে দাঁড়িয়ে মালাকে জিজ্ঞেস

করে, জায়গাটা কেমন ?

খুব ভাল।

এখানে মাঝে মাঝে এসে থাকলে কেমন হয় ?

মালা হেসে বলে, তা আবার বলতে হবে ?

বিমান পাশাপাশি দুটো সিঙ্গল রুম কটেজ বুক করেছে বলে মালা জিজ্ঞেস করে, এখানে পাশাপাশি দুটো ঘর নেই ?

আছে।

তাহলে সেইরকম কটেজ বুক করলে না কেন ?

পেলাম না।

ও !

তবে কটেজ দুটো এত কাছাকাছি যে আমাদের আড্ডা দিতে কোনো অসুবিধে হবে না।

হ্যাঁ। এই দুটো কটেজের মাঝে তো ঐ কয়েকটা গাছ !

ওরা কিছুক্ষণ লেকের ধারে, গাছপালার আলোয়-ছায়ায়, বিস্তীর্ণ সবুজের মেলায় ঘোরাঘুরি করে। বিমান বলে, আমার কটেজে একটু যাবে ?

কেন ? দরকার আছে ?

হ্যাঁ, একটু দরকার আছে।

চলো।

বিমান ওর কটেজে ঢুকে দরজাটা একটু ভেজিয়ে মালাকে বলে, চোখ বন্ধ করো।

হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, চোখ বন্ধ করব কেন ?

দরকার আছে।

মালা চোখ বন্ধ করতেই বুঝতে পারে বিমান এ্যাটাচি খুলল। তারপর বিমান বলে, হ্যাঁ, এবার চোখ খুলতে পারো।

সামনের ড্রেসিং টেবিলের বিরাট আয়নায় নিজেকে দেখেই মালা চমকে ওঠে একি ! তুমি আমাকে····

আগে বলো, তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা।

লকেটটা এত সুন্দর আর পছন্দ হবে না? স্টোনগুলো কী দারুণ দেখাচ্ছে!

বিমান পেছন দিক থেকে ওকে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, তোমার বুকের ওপর যে লকেট থাকবে, তাতে ডায়মণ্ড ছাড়া কি আর কিছু দেওয়া যায়?

সামনের আয়নায় মালা একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিজেদের দেখে নিয়েই প্রশ্ন করে, হঠাৎ এত দামী জিনিস দিলে কেন?

বিমান ওকে জড়িয়ে ধরেই বলে, আমার ইচ্ছে করল।

তাই বলে এত দামী?

তোমাকে কী আজেবাজে জিনিস দেওয়া যায়? বিমান একটু থেমে বলে, তবে বেশি দামী না। চেনটার ওজন বারো আনা, লকেটটা মাত্র আট আনার····

আর অতগুলো ডায়মণ্ডের বুঝি দাম নেই?

মাঝখানের ডায়মণ্ডটাই সামান্য একটু বড়। বাকিগুলো তো অত্যন্ত ছোট ছোট।

এবার মালা ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে মুহূর্তের জন্য ওর চোখের উপর চোখ রেখেই ওর ওষ্ঠে ভালবাসার প্রথম স্মৃতি রেখে দেয়।

বিমান একটু হেসে বলে, থ্যাঙ্ক ইউ!

কটেজ থেকে বেরিয়ে এসে রেস্তোরাঁর দিকে এগুতেই সুদীপের সঙ্গে দেখা। ও জিজ্ঞেস করে, তোরা কতক্ষণ এসেছিস?

বিমান বলল, এইতো এখুনি।

মালা একটু হেসে সুদীপকে বলে, আমার গলার দিকে তাকিয়ে দেখ!

সুদীপ এক ঝলক দেখেই বলল, বাঃ! ওয়াণ্ডারফুল!

মালা লকেটটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে করতেই বলে, বিয়ের আগে কোনো গহনা পরিনি, বিয়ের সময়ও কোনো গহনা জুটল না।

তাই তোমার টাকা দিয়ে এটা বানিয়ে নিলাম !

খুব ভাল করেছ। কটেজের দিকে এগুতে এগুতে সুদীপ বলে, তাছাড়া তোমার গলায় দারুণ দেখাচ্ছে।

বিমান একটু হেসে বলে, হ্যাঁরে সুদীপ, তোর বউ তো দেখছি অতি বুদ্ধিমতী ও সুগৃহিণী।

মালা সুন্দরী, শিক্ষিতা, কর্মনিপুণা, রুচিশীলা, বুদ্ধিমতী, সুগৃহিণী, কর্তব্যপরায়ণা, বন্ধুবৎসল, উদার, পরোপকারী····

সুদীপের কথা শুনে ওরা দুজনেই হো হো করে হেসে ওঠে।

সুদীপ পাজামা-পাঞ্জাবি নিয়ে স্নান করার জন্য বাথরুমে ঢুকতে যাবার সময় বিমান বলল, তুই স্নান করেই আমার কটেজে চলে আয়। আমরা যাচ্ছি।

হ্যাঁ, তোরা যা, আমি পনের-বিশ মিনিটের মধ্যেই আসছি।

বিমান নিজের কটেজে পা দিয়েই মালাকে বলল, তুমি তো দারুণ মেয়ে !

কেন, কী হলো ?

হারের ব্যাপারটা যেভাবে ঘুরিয়ে দিলে····

সংসারে বাস করতে হলে সব সময় কি সত্যবাদী হওয়া যায়, নাকি হওয়া উচিত ? এ সংসারে সবাইকে সব কথা বললে তো ঘরে ঘরে আগুন জ্বলে উঠবে।

ঠিক বলেছ। আমাদের ব্যাপার শুধু আমরাই জানবো।

মালা ওর হাত দুটো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, আমি তোমার বন্ধুত্ব ভালবাসাও হারাতে চাই না, আবার তোমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি হোক, তাও চাইব না।

বিমান হেসে বলে, তুমি তো দারুণ বুদ্ধিমতী।

বোকা হলে কী তুমি ভালবাসতে ?

বিমান ষোল আনা উদ্যোগ-আয়োজন করেই এসেছে। দুটো স্কচের বোতল, চীজ, কাজু, এক কার্টুন স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট ও

আরো কত কি! বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে তলব করে অর্ডার দেয়, তিন প্লেট ফিস ফ্রাই, পটাটো চিপস, সোডা, ঠাণ্ডা জল, আইস নিয়ে এসো।

মালা বলল, ফিস ফ্রাইয়ের বদলে ফিস ফিংগার আনুক।

বিমান এবার এক মুহূর্তের জন্য ভেবে বলে, তাহলে এক কাজ করো। এক প্লেট ফিস ফিংগার আর একটা তন্দুরী চিকেন আনো।

ঠিক হ্যায় সাব!

সুদীপ আসতে না আসতেই বেয়ারা সবকিছু নিয়ে এসে যায়। জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে কী হুইস্কী এনেছিস?

বিমান একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলে, যে হুইস্কি হলিউড স্টাররা খায়, সেই হুইস্কীই এনেছি।

মালা বলে, বিমানদার কোনো কিছুই সাধারণ ব্যাপার না।

সুদীপ বলে, বিমান নিজেই কী সাধারণ আছে?

বিমান ব্যালানটাইনস্-এর বোতল খুলে তিনটে গেলাসে ঢালতেই মালা জিজ্ঞেস করে, আমাকেও কী হুইস্কী খাওয়াবে?

বিমান বোতলে একটা চুমু খেয়েই বলে, একি হুইস্কী? এ স্বর্গের দেবতাদের সুরা!

ওরা দু'জনে হাসে।

শুরু হয় খাওয়া-দাওয়া হাসি-ঠাট্টা।

বিমান সুদীপকে জিজ্ঞেস করে, তুই বোধহয় এই জায়গাটা ভাল করে দেখারও টাইম পাস নি?

আমি ঐ ওপরের অফিসে তোদের খবর নেবার পর এক চক্কর ঘুরে নিয়েছি।

মালা বলল, জায়গাটা কি সুন্দর না?

হ্যাঁ, সত্যি বেড়াবার মত জায়গা।

বিমান বলে, দ্যাখ সুদীপ, আমরা গরীবের ঘরের ছেলে। একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া, পছন্দমত জামা-কাপড় পরা বা একটু-আধটু ঘুরে-

ফিরে আনন্দ-স্ফূর্তি করার সুযোগ আমরা কেউই পাই নি ;....

সুদীপ বলে, সে তো একশ'বার।

এখন আমরা যথেষ্ট আয় করছি, বাবা-মা ভাইবোনের জন্যও কম করা হচ্ছে না। বিমান হুইস্কীর গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে বলে, তুই ভাইকে মাসে মাসে চারশো পাঠানো ছাড়াও মা'কে আড়াইশো দিচ্ছিস।

মালা বলে, এ ছাড়া মাঝে মাঝে কাপড়-চোপড়ও পাঠানো হচ্ছে দু'বাড়িতেই।

সুদীপ একটুকরো চিকেন মুখে দিতে দিতে বলে, তুই তো আরো অনেককিছু করছিস।

তোরা তো জানিস আমার বাবা অত্যন্ত বেহিসেবী লোক। তাছাড়া বউ-ছেলেমেয়ে খেতে পাক আর নাই পাক, তার রোজ মদ্যপান করা চাই।

কথাটা শুনে সুদীপ আর মালা মুখ নীচু করে।

বিমান থামে না, বলে যায়, আমি মাসে মাসে মাত্র আড়াইশো টাকা মনি অর্ডার করি। বোনটার বিয়ের জন্য গহনা-টহনা ঘড়ি কিনে ব্যাঙ্কের লকারে রাখা ছাড়াও পঁচিশ হাজার টাকা কলকাতায় রাখা আছে।

মালা বলল, তুমি তো বাড়িও বানাচ্ছ।

হ্যাঁ, লেক টাউনের পাশেই তিন কাঠা জমি কিনে একটা ছোট দোতলা বাড়ি এমন করে তৈরী করছি যাতে একটা তলায় একজন ভাল লোককে ভাড়া দিতে পারি।

সুদীপ বলে, তুই আর কী করবি ?

বিমান বলে, বছর খানেকের মধ্যে তোর বাড়ি তৈরিও যাতে শুরু হয়, সে ব্যবস্থা করব।

সুদীপ হাসে।

হাসছিস কিরে ? চিরকালই কী তুই এইরকম টাকা রোজগার করবি ? বিমান একটু হেসে বলে, যতই হুইস্কী-টুইস্কী খাই, ভবিষ্যতের

ব্যবস্থা তো করতে হবে।

মালা বলল, ঠিক বলেছ।

সুদীপ আর নিজের খালি গেলাস আবার ভরে নিয়ে এক চুমুক দিয়েই বিমান হাসতে হাসতে বলে, ফ্যামিলীর জন্য আমরা দু'জনেই যথেষ্ট করছি। তবে যখন ভাল আয় করছি, তখন ভালভাবে থাকব, প্রাণভরে আনন্দ করব, কী বল ?

সুদীপের বেশ মুড এসে গেছে। বলে, জরুর !

বিমান মালার দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি তো এতক্ষণে অর্ধেকও শেষ করতে পারলে না।

আমি তো শুধু তোমাদের কম্পানী দেবার জন্য খাচ্ছি। তাছাড়া আমি তো এসেছি ঘুরে-ফিরে বেড়াতে আর আড্ডা দিতে। বেশী খেলে আড্ডা দেব কী করে ?

আর এক রাউণ্ড তো খাবে !

মোটেও না। আর এক পেগ খেলেই আমার ঘুম পাবে আর আড্ডা দেওয়াটা মাটি হবে।

গুড আইডিয়া !

সুদীপ বলে, বিমান, মালাকে কাঁচা মেয়ে ভাবিস না। গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে বলে, তবে আজ আমার সত্যি আনন্দের দিন। আই এ্যাম ভেরি হ্যাপি টু-ডে এ্যাণ্ড আই মাস্ট ড্রিঙ্ক টু মাই ফুল স্যাটিশফ্যাকশন !

মালা জিজ্ঞেস করে, তুমি কী শুধু ড্রিঙ্ক করতে এখানে এসেছ ? নাকি গল্পগুজব-আড্ডা দিতে এসেছ ?

ফর বোথ।

বেয়ারা এসে ডিনারের অর্ডার নিয়ে চলে যায়। আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর মালা বলে, চলো, আমরা একটু ঘুরে আসি।

বিমান গেলাসে শেষ চুমুক দিয়েই বলে, সত্যি একটু ঘুরে আসা যাক। ওঠ সুদীপ, ওঠ।

না রে, আমি বড্ড টায়ার্ড। আমি আর বাইরে যাব না।

বেয়ারা ডিনার নিয়ে ঘরে ঢুকতেই বিমান বলে, না, না, খেয়েদেয়ে আমরা তিনজনেই একটু ঘুরতে যাব।

কিন্তু না, খাওয়া-দাওয়ার পরও সুদীপ বেরুতে চায় না। বলে, তোরা বরং একটু ঘুরে আয়। ততক্ষণ আমি একটু বিশ্রাম করি।

আমরা বাইরে গেলেই তুই তো ঘুমিয়ে পড়বি।

না, না, আমি ঘুমোব না।

মালা বলে, তুমি যদি ঘুমোও তাহলে কিন্তু আমি ফিরে এসেই তোমাকে টেনে তুলব।

সুদীপ হেসে বলে, না, না, আমি ঘুমোব না।

বেশিক্ষণ না, পনের বিশ মিনিট পর ওরা ঘুরে আসতেই দেখে, সুদীপ বেহুঁস হয়ে ঘুমুচ্ছে।

দাঁড়াও বিমানদা, আমি ওকে টেনে তুলছি।

না, না, মালা, ওকে ঘুমোতে দাও। ফ্যাক্টরীতে সারাদিন দৌড়-ঝাঁপ করে বেচারা সত্যি টায়ার্ড হয়ে যায়।

তাই বলে আজও....

বিমান ওর কোমরটা ধরে কাছে টেনে নিয়ে একটু চাপা গলায় বলে, চল, আমরা ঐ কটেজে গিয়ে গল্প করি।

আর হুইস্কী খাবে না?

বিমান ওর ঠোঁটের চারপাশে একটা আঙুল দিতে দিতে বলে, এই হুইস্কী খাব না!

সব আগুনের শিখাই উপরের দিকে ওঠে—সে আগুন পবিত্র হোমাগ্নিরই হোক চিতাগ্নিরই হোক, তার শিখা সীমাহীন উদার অনন্ত আকাশের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু কামনা-বাসনা-লালসার বহ্নিশিখা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে জানে না, পারে না, সে শুধু নিচে নামতে জানে

সেদিন রাত্রে ওরা দু'জনে উদগ্র কামনার স্রোতে আনন্দের মহাসাগরে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ কোথায় যেন তলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল।

॥ আট ॥

অটোয়াল সাহেবের কারখানায় কোন পারচেজ অফিসার নেই। এঞ্জিনিয়াররা ঠিক করেন, কোন্ কোম্পানী থেকে কী পার্টস নেওয়া হবে। কবে ও কত দামে এইসব পার্টস নেওয়া হবে, তা ঠিক করেন যোশীজী। তবে ঐসব সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে জিনিসপত্র ঠিক সময় ডেলিভারী নেবার দায়-দায়িত্ব স্টোর্স অফিসারের।

পেমেণ্টের ব্যাপারে অটোয়াল কোম্পানীর সুখ্যাতি আছে বলে অধিকাংশ সাপ্লায়ারই নিজেদের স্বার্থে ঠিক সময় পার্টস-টার্টস ডেলিভারী দেয়। প্রয়োজনে টেলেক্স পাঠানো হয়। কিন্তু কখনো কখনো এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে স্টোর্স অফিসারকে ছুটতে হয় এখানে ওখানে।

সেদিন ফ্যাক্টরীতে গিয়ে যোশীজীকে না দেখে অনেকেই অবাক। একটু পরেই টেলিফোন অপারেটর জানালো, যোশীজী অটোয়াল সাহেবের বাড়িতে আছেন। সাড়ে ন'টা-দশটা নাগাদ ফ্যাক্টরীতে আসবেন।

দশটার আগেই অটোয়াল সাহেব আর যোশীজী ফ্যাক্টরীতে এসেই এঞ্জিনিয়ারদের ঘরে ডেকে পাঠালেন। কয়েক মিনিট পর সুদীপেরও ডাক পড়ল। অটোয়াল সাহেব বললেন, আজ সকালে ইকনমিক টাইমস'এ খবর বেরিয়েছে, আসানসোল-ঝরিয়া এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীতে হঠাৎ স্ট্রাইক হয়েছে।

খবরটা শুনেই প্রোডাকশন এঞ্জিনিয়ার মহীন্দর সিং বললেন, মাই গড!

অটোয়াল সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, হ্যাঁ, ইট ইজ এ প্রেটি সিরিয়াস ম্যাটার। ওরা যদি আমাদের কাজগুলো এই মাসের মধ্যে না করে দেয়, তাহলে আমরা কিছুতেই ঠিক সময় লিবিয়ায় মাল পাঠাতে পারব না এ্যাণ্ড দ্যাট মীনস উই উইল সাফার লস টু দ্য টিউন অফ ফিফটি ল্যাকস্।

ওয়ার্কস ম্যানেজার মিঃ দেশপাণ্ডে বললেন, শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজেও তো আমাদের স্পেস বুক করা আছে। এখন বুকিং ক্যানসেল করলেও টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পেমেন্ট করতেই হবে।

অটোয়াল সাহেব বললেন, দ্যাটস রাইট। উনি একটু থেমে বললেন, অনেক সময় অনেক কোম্পানী কিছু স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্ট্রাইক না হলেও স্ট্রাইকের খবর ছড়িয়ে দেয়।

মিঃ দেশপাণ্ডে একটু হেসে বললেন, সর্ট টাইমের মধ্যে কোন ভাল অর্ডার এক্সিকিউট করতে হলে এই ফরিদাবাদের কয়েকটা ফার্ম ঐ ধরনের মিথ্যে খবর ছড়িয়ে দেয়।

এবার যোশীজী বললেন, লিবিয়ার কনট্রাক্ট কিছুতেই ক্যানসেল হতে দেওয়া হবে না এবং তার জন্য আমাদের একই সঙ্গে দুটো কাজ করতে হবে। নাম্বার ওয়ান—নো টেলিফোন, নো টেলেক্স, সামবডি মাস্ট রাস্ টু আসানসোল টু সী থিংগস্ ফর হিমসেলফ্।

মহীন্দর সিং বললেন, ঠিক বলেছেন।

যোশীজী বলে যান, যদি স্ট্রাইক না হয়ে থাকে, তাহলে যেভাবেই হোক ওদের দিয়ে কাজটা করিয়ে নিতে হবে। দরকার হলে, ওরা ওয়ার্কারদের ওভার-টাইম দিক এবং আমরা তার জন্য এ্যাজ এ স্পেশ্যাল কেস পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত ওদের একসেস্ পেমেন্ট করতে রাজী।

অটোয়াল সাহেবের মুখ গম্ভীর। সবাই চুপ।

সেকেণ্ডলি, যোশীজী বলেন, মহীন্দর লাঞ্চের পরই গাড়ি নিয়ে কানপুর যাক। ওখানে যদি গুপ্তাজীরা বা জয়সওয়ালরা আমাদের কাজটা করে দিতে পারে, তাহলে····

মিঃ অটোয়াল জিজ্ঞেস করলেন, আসানসোলে কাকে পাঠাবেন? দেশপাণ্ডেকে?

মহীন্দর আর দেশপাণ্ডে দু'জনকে বাইরে পাঠিয়ে দিলে আমি ফ্যাক্টরী চালাব কী করে? যোশীজী একটু ভেবে বললেন, আই সাজেস্ট সুদীপ্ত শুড গো টু আসানসোল।

অটোয়াল সাহেব সুদীপের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কী

সুদীপ্তবাবু, সিচুয়েশনটা হ্যাণ্ডেল করতে পারবেন তো ?

স্যার, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট।

যোশীজী বললেন, সুদীপ্ত ইন্টেলিজেন্টও আছে, সিনসিয়ারও আছে, পারবে না কেন ?

কিছুক্ষণ পর অটোয়াল সাহেব আর যোশীজী গোপনে সুদীপকে বললেন, যদি ওখানে গিয়ে দেখ, সত্যি সত্যিই কোন কারণে ওয়ার্কাররা হঠাৎ স্ট্রাইক করেছে, তাহলে যেভাবেই হোক ইউনিয়নের লীডারদের ইনফ্লুয়েন্স করতে হবে। অন্যদিকে ম্যানেজমেণ্টকেও চাপ দেবে।

সুদীপ জিজ্ঞেস করে, পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্সের কথা বলছেন ?

যোশীজী বললেন, পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্সে কোন কাজ হবে না। ট্রেড ইউনিয়ন লীডাররা শুধু নিজেদের আর কিছু মোসাহেবের স্বার্থ বোঝে।

অটোয়াল সাহেব বলেন, সোজা কথা, ওদের পকেটে এক একটা বাণ্ডিল দিতে পারলেই দেখবে ওদের সুর বদলে গেছে।

যোশীজী বললেন, ওদের সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্কস ম্যানেজার শর্মা আর লেবার অফিসার ঘোষকেও কিছু খাইয়ে নিজের দলে টেনে নেবে।

সুদীপ চুপ করে থাকে কিন্তু মনে মনে একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে পারে না।

অটোয়াল সাহেব বললেন, তুমি আজই ইভনিং ফ্লাইটে কলকাতা যাবে। কিন্তু বাড়িতে উঠবে না। গ্রাণ্ডে ঘর বুক করে দেওয়া হচ্ছে। ওখানেই থাকবে আর কাল ভোরবেলার ট্রেনেই আসানসোল যাবে।

যোশীজী বললেন, তোমাকে আমরা দু'লাখ দিয়ে দিচ্ছি। যদি দেখ, আরও কিছু লাগবে, তাহলে আমাকে জানালেই তার ব্যবস্থা করব।

এতক্ষণ পর সুদীপ জিজ্ঞেস করে, আমার সঙ্গে বিমান গেলে ভাল হতো না ?

অটোয়াল সাহেব ও যোশীজী প্রায় একই সঙ্গে বলেন, নো নেভার !

অটোয়াল সাহেব বললেন, আপনি বিমানকে আসানসোল যাবার

কথা বলবেন কিন্তু কীভাবে কাজটা হাসিল করতে বললাম, তা কখনই জানাবেন না।

যোশীজী বলেন, এই টাকাকড়ির ব্যাপারটা যেন কেউ না জানতে পারে—নট ইভন ইওর ওয়াইফ!

সুদীপ একটু চিন্তিত হলেও মাথা নেড়ে বলে, না, না, কেউ জানবে না।

অটোয়াল সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, যোশীজী, আমি অফিসে গিয়ে সুদীপ্তবাবুর এয়ার টিকিট, হোটেল রিজার্ভেশন আর গাড়ির ব্যবস্থা করছি। আপনি ওর পার্সোন্যাল খরচের টাকা এখান থেকেই দেবেন।

অটোয়াল সাহেব চলে যাবার পর যোশীজী ওকে বলেন, আমি এয়ারপোর্টে গিয়ে তোমাকে যে ব্রীফকেসটা দেব, তার মধ্যেই ঐ দু'লাখ টাকা আর কাগজপত্র থাকবে। বিমান বা তোমার স্ত্রী এয়ারপোর্টে গেলে ওদের সামনেও ব্রীফকেস খুলবে না।

না, না, খুলব না।

আর হ্যাঁ, কাল আসানসোল যাবার সময় অত্যন্ত সাধারণ জামা-কাপড় পরবে, যাতে কেউ না বুঝতে পারে তোমার কাছে অত টাকা আছে। যোশীজী একটু হেসে বলেন, আসানসোল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া খুব ভাল জায়গা না।

হ্যাঁ, তা জানি।

যোশীজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেই সুদীপ বিমানকে টেলিফোন করে ওর আসানসোল যাবার কথা বলে। বিমান বলল, একটু আগেই অটোয়াল সাহেব অফিসে এসেছেন। তার কাছেই সব শুনলাম। তোর প্লেনের টিকিট আর হোটেল রিজার্ভেশনের জন্য পাঁচ মিনিট আগেই নায়ারকে পাঠালাম।

হ্যাঁরে, এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে যাবার জন্য কোনো গাড়ির ব্যবস্থা....

অটোয়াল সাহেবের ভাইপো কলকাতায় থাকে। উনি তাকে

খবর দিচ্ছেন তোকে এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে পৌঁছে দেবার জন্য।

ও!

কাল সকালে ওই তোকে হাওড়ায় পৌঁছে দেবে।

শোন, তুই একটু মালাকে বলে দিবি, ও যেন ছোট সুটকেশটায় আমার দুটো-তিনটে প্যান্ট, বুশসার্ট, পায়জামা-টায়জামা আর সেভিং···

আর বলতে হবে না। আমি এখুনি বলে দিচ্ছি।

ফ্যাক্টরীর হাজার ঝামেলা মিটিয়ে সুদীপ যখন গেস্টহাউসে ফিরে আসে, তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। মালা বলল, দশ মিনিট আগে অটোয়াল সাহেব ফোন করেছিলেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, তুমি এলেই ফোন করতে বলেছেন।

সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে ওকে ফোন করে। উনি বলেন, যোশীজীর কাছ থেকে ব্যাপারটা খুব ভাল করে বুঝে নিয়েছেন তো?

হ্যাঁ, স্যার।

বুঝতেই পারছেন, খুব ডেলিকেট ব্যাপার। বী ভেরি কেয়ারফুল।

স্যার, আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না।

সেটা আমরা ভাল করে জানি বলেই আপনাকে পাঠানো হচ্ছে।

অটোয়াল সাহেব একটু থেমে বলেন, আমার বড় দাদার ছেলে জগৎ সিং অটোয়াল এয়ারপোর্টে থাকবে। ও আপনাকে আজ হোটেলে পৌঁছে দেবে, আবার কাল সকালে ট্রেনে চড়িয়ে দেবে।

অটোয়াল সাহেব ওর ভাইপোর গাড়ির রং, নম্বর ও উনি কোথায় দাঁড়িয়ে থাকবেন ইত্যাদিও বলে দেন। সব শেষে বলেন, আপনার হোটেলে পৌঁছবার খবর ও আসানসোল রওনা হবার খবর ভাইপোই আমাকে জানিয়ে দেবে কিন্তু কাল রাত্তিরে আমি আপনাকে ফোন করব। অল দ্য বেস্ট!

সুদীপ চা খেতে খেতে মালাকে বলে, আমি যে আসানসোল যাচ্ছি,

তা যেন বাইরের কেউ না জানে।

না, না, আমি কাকে বলব ?

খুব কনফিডেন্সিয়াল কাজে যাচ্ছে বলে যোশীজী আর অটোয়াল সাহেব দুজনেই বার বার বলেছেন বলে তোমাকে বললাম।

মালা বলে, আমি সুটকেশে তিনটে করে জামা-প্যাণ্ট ভরে দিয়েছি।

পায়জামা-টায়জামা····

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব কিছু আছে।

বাথরুমে ঢোকার আগে সুদীপ বলে, দোতলা'য় তোমার একলা একলা থাকতে ভয় করবে না তো ?

মালা একটু হেসে বলে, বাড়িতে বিমানদা ছাড়াও চৌকিদার আর বেয়ারা তো থাকবে। ভয় আবার কিসের ?

যাই হোক ঘুমুবার আগে দরজা-টরজা ভাল করে বন্ধ করে নিও।

সে আর বলতে হবে না।

সুদীপ তৈরি হতে না হতেই বিমানও অফিস থেকে এসে যায়। বলে, এই নে তোর প্লেনে আসা-যাওয়ার টিকিট আর তোর হোটেল রিজার্ভেশনের কাগজ।

সুদীপ ওগুলো হাতে নিতেই বিমান বলে, রিটার্ন জার্নিটা ওপন আছে। তোকে রিজার্ভেশনটা করে নিতে হবে।

ঠিক আছে।

আর হোটেলে তোকে কোনো পেমেণ্ট করতে হবে না। বিল সই করে দিবি।

সুদীপ হেসে বলে, তোর দয়ায় রাতারাতি এ্যারিস্টোক্রাট হয়ে গেলাম।

দয়া-টয়া বললে মার খাবি।

হ্যাঁ, যোশীজী এয়ারপোর্টে এসে ব্রীফকেসটা ওকে দিয়ে বললেন, এর মধ্যে সব কাগজপত্র আছে। কোনো কাগজ যেন না হারায়।

না, না, হারাবে না।

অটোয়াল সাহেব কাল রাত্রে তোমাকে টেলিফোন করবেন। যদি কাল রাত্রে না ফিরতে পারো, তাহলে পরশু সকালে-রাত্রে দু'বেলাই ফোন করবেন। যোশীজী একটু চোখ টিপে বলেন, যদি আরো দু'একটা কাগজের দরকার হয়, তাহলে অটোয়াল সাহেবকে বলে দিও।

সুদীপ মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

শেষে যোশীজী একটু হেসে বলেন, মোটকথা ওরা যাতে তাড়াতাড়ি আমাদের কাজটা করে দেয়, সে ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে।

আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।

যোশীজী ওর পিঠে হাত দিয়ে বলেন, ব্যস, ব্যস, তা হলেই ঠিক কাজ হবে।

এবার সুদীপ মালাকে বলে, সাবধানে থেকো।

তোমার কোনো চিন্তা নেই। তুমি কাজ হয়ে গেলে আর দেরি করো না।

না, না, দেরি করব না। এবার ও বিমানকে বলে, মালা একলা থাকবে। তুই অফিসে গিয়েও মাঝে মাঝে টেলিফোন করে একটু খবর নিস।

বিমান হেসে বলে, ওরে তোর বউ ভালই থাকবে। তুই কাজ শেষ করে ফিরে আয়।

আমার কাজ শেষ হবার পর বড়জোর একটা বেলা বাড়িতে থাকব।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা থাকবি বৈকি!

কত বড় কত সুন্দর বোয়িং প্লেন, গ্রাণ্ডের ঘরটা যেন স্বপ্নপুরী। সর্বত্রই রাজপুত্তুরের মত খাতির-যত্ন কিন্তু সুদীপ ঠিক উপভোগ করতে পারে না। মনের মধ্যে সব সময় দুশ্চিন্তা! পারবে তো কাজটা হাসিল করতে? ব্ল্যাক ডায়মণ্ড এক্সপ্রেসে যেতে যেতেও ঐ একই চিন্তা। মিঃ শর্মা বা মিঃ ঘোষ কী ধরনের মানুষ, কী ধরনের ব্যবহার করবেন, তা কে জানে! ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের কথা ভাবতে গিয়েই ওর মাথা

ঘুরে যায়। ওরা তো এক একজন এক একরকম! শ্যামপুকুরে অতুলবাবুর কাছে যখন ও কোচিংয়ে যেতো, তখন তো ওর ভাই অশোকদাকে দেখেছে! উনি তো এই আসানসোল, রাণীগঞ্জ এলাকারই দু'চারটে ইউনিয়নের পাণ্ডা! কী কাঁচা পয়সাই উনি ওড়াতেন! তবে হ্যাঁ, উনি বেশ প্রাণখোলা দিলদরিয়া মানুষ ছিলেন। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখতে হবে? ধরো অশোকদাকে। পিকনিক? ফুলেশ্বরে যাবার জন্য গাড়ি চাই? ধরো অশোকদাকে। কী? দিদির বিয়ে?

অশোকদা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলে, তোর দিদির বিয়েতে আমি কী করব?

মানিক বলে, তুমি তো মণ্টুর ছোড়দির বিয়ের সময় বর্ধমান থেকে কী সুন্দর দই-মিষ্টি কত সস্তায় ব্যবস্থা····

মানিককে পুরো কথাটা শেষ করতে হয় না। তার আগেই অশোকদা বলেন, ও! দই-মিষ্টি! হ্যাঁ, তা হাফ দামে করে দিতে পারবো।

এ ছাড়া প্রত্যেকবার দুর্গাপুজোর সময় যে ওরা একদল বন্ধুবান্ধব রাত এগারটা-সাড়ে এগারটা থেকে সারা রাত্তির ধরে মোটরে চড়ে সমস্ত কলকাতা ঘুরে বেড়াতো, সে ব্যবস্থাও তো ঐ অশোকদাই করতেন। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বলতেন, কার গাড়ি কে দেয়, তাতে তোদের দরকার কী? তোরা পুজো প্যাণ্ডেল ঘুরতে চেয়েছিস, ঘুরে আয়।

বেশী জোর জুলুম করলে উনি হাসতে হাসতে বলতেন, ওরে ট্রেড ইউনিয়ন লীডারদের কে খাতির করে না? কল-কারখানা-কোম্পানীর মালিক-অফিসার-অফিসের বাবুরা থেকে জমাদাররা পর্যন্ত আমাদের খাতির করে। না খাতির করে উপায় নেই।

অশোকদা তুড়ি মেরে সিগারেটের ছাই ফেলে দিয়ে একটু হেসে বলেন, মালিককে টাইট দিতে হলে ক্যান্টিনে ভাঙা কাপে চা দিয়েছে বলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে কোনো কারখানায় স্ট্রাইক করে দেওয়া যায়।

অতুলবাবুর কোচিংয়ের একদল ছাত্র ওর কথা শুনে হাসে।

হাসছিস কীরে? ক্যান্টিনের ভাঙা কাপ-ডিস বা পেচ্ছাবখানা কম আছে বলে কতবার কত ফ্যাক্টরীতে স্ট্রাইক করে দিয়েছি। অশোকদা এবার গম্ভীর হয়ে বলেন, কত শ্রমিকের জন্য কটা পেচ্ছাবের জায়গা বা পায়খানা থাকবে, তাও আইন করে দেওয়া আছে কিন্তু তা কেউ মেনে চলে না, চলার দরকারও হয় না।

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড এক্সপ্রেসের কামরায় বসে হঠাৎ এইসব কথা মনে পড়ে সুদীপের।

যাইহোক কারখানার সামনে পৌঁছে মেন গেট বন্ধ দেখেই ওর মুখ শুকিয়ে যায়। তবে দেখল, একটু দূরে ছোট একটা গেট খোলা আছে। দারোয়ান বলল, হ্যাঁ, অফিসে সাহেবরা আছেন কিন্তু কোনো বাবুকে পাবেন না।

মিঃ শর্মা বা মিঃ ঘোষ তো আছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওরা আছেন।

গেট থেকে অফিস বিল্ডিংয়ে যাবার পথে সুদীপ দেখল, সত্যি কারখানা বন্ধ কিন্তু পশ্চিমদিকের একটা টালির ঘরের সামনে বেশ কিছু লোকের ভীড়। না, ওখানে না গিয়ে সুদীপ অফিসেই গেল। পরিচয় দিতেই ওয়ার্কস ম্যানেজার মিঃ শর্মা ওকে সাদরে অভ্যর্থনা করে বললেন, একটা সামান্য ব্যাপারের জন্য আজ তিন দিন ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে পড়ে আছে অথচ এ ব্যাপারে আমাদের কিচ্ছু করণীয় নেই।

কী হয়েছিল?

আর বলবেন না মিঃ সরকার। এখানকার লেবার যে কখন কী কারণে ক্ষেপে যাবে, তা বোধহয় ভগবানই জানেন না।

সুদীপ একটু হেসে বলে, তা একটু একটু জানি।

ইতিমধ্যে চা আসে। মিঃ শর্মা সুদীপের দিকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলেন, হলদিয়া পোর্টের একটা কাজের নাইনটি পার্সেন্ট হয়ে গেছে। আর একদিন কাজ করতে পারলেই ওটা শেষ করা যায়। কিন্তু যদি কোনো কারণে কামিং উইকের কাজটা শেষ করতে না পারা

যায়, তাহলে হিউজ কমপেনসেশন দিতে হবে।

আমাদেরও তো একই অবস্থা। সুদীপ একটু থেমে বলে, আপনি তো ভাল করেই জানেন, এইসব এক্সপোর্টের ব্যাপারে একটা দিন দেরি হলেই আমরা জাহাজ মিস্ করব। তাছাড়া···

মিঃ সরকার, আমরা তো আপনাদের কাজ অনেক বছর ধরে করছি। সো আই নো এভরি থিং।····

এবার সুদীপ প্রশ্ন করে, আচ্ছা স্ট্রাইক হলো কেন?

মিঃ শর্মা একটু হেসে বলেন, ইউনিয়নের এক পাণ্ডাকে বুঝি ছোট মাছ দেওয়া হয়েছিল। ব্যস! সেই থেকেই শুরু। এখন ইউনিয়ন বলছে, ক্যান্টিনের সবকিছুই খারাপ।

সুদীপ হাসে।

হাসছেন কী মিঃ সরকার? সত্যি কথাই বলছি। মিঃ শর্মা হাত নেড়ে নেড়ে বলেন, ইউনিয়ন বলছে, নতুন চেয়ার-টেবিল চাই, নতুন ক্রকারিজ চাই, ভাল চাল, ভাল চা, ভাল রান্না এটসেটরা, আরো কত কি চাই।

আপনারা কী বলছেন?

আমরা কী বলব? ক্যান্টিনের কণ্ট্রাক্টর ঠিক করে ইউনিয়ন, ক্যান্টিন কমিটির চেয়ারম্যান আমাদের লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার মিঃ ঘোষ হলেও ওরাই মেজরিটি····

ক্যান্টিনের কণ্ট্রাক্টর কী বলছে?

ক্যান্টিনের কণ্ট্রাক্টর বলছে, সে নতুন চেয়ার-টেবিল স্টেনলেস স্টীলের থালা-গেলাস-বাটি সবকিছু কিনবে কিন্তু ওয়ার্কারদের কাছে যে হাজার চল্লিশেক টাকা বাকী পড়ে আছে, তা ওরা দিয়ে দিক।

সুদীপ একটু হেসে বলল, কণ্ট্রাক্টর ঠিকই বলেছে।

মিঃ শর্মা হেসে বলেন, ওয়ার্কাররা বলছে, কোম্পানী থেকে কণ্ট্রাক্টরকে ঐ টাকাটা দিয়ে দিক কিন্তু কোম্পানী ঐ টাকা কেন দেবে?

সে তো বটেই।

তাছাড়া সব ওয়ার্কাররা তো ধারে খায় নি। আবার কারুর ধার আছে দশ টাকা, কারুর ধার আছে পাঁচশো টাকা।

সুদীপ বলে, ঐ টাকাটা দেওয়া উচিত না ঠিকই কিন্তু ফ্যাক্টরী বন্ধ থাকার জন্য তো আপনাদের অনেক বেশী ক্ষতি হচ্ছে।

ঠিক বলেছেন কিন্তু রিমেম্বার দিস ইজ আসানসোল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট! এখানে একবার যদি একটা অন্যায় মেনে নেন, তাহলে ভবিষ্যতে আরো কত অন্যায় মেনে নিতে হবে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মিঃ শর্মা একটু থেমে একটু হেসে বলেন, তাছাড়া আমাদের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট যা পাগলা মানুষ!

কে আপনাদের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট?

তেমন কোনো নামকরা ট্রেড-ইউনিয়ন লীডার না। আপনি তার নামও শোনেননি বাট হি ইজ ভেরি পপুলার হিয়ার।

কী নাম তার?

অশোক মুখার্জী।

অশোকদা! সুদীপ প্রায় লাফিয়ে ওঠে।

আপনি তাকে চেনেন নাকি?

খুব চিনি। অশোকদা কোথায় আছেন বলতে পারেন?

ঐতো ইউনিয়ন অফিসে মিটিং করছেন।

সুদীপ জিজ্ঞেস করে, আমি ওর ওখানে যেতে পারি?

বাই অল মীন্স! মিঃ শর্মা সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজিয়ে দারোয়ানকে তলব করে বলেন, এই সাহেবকে ইউনিয়ন অফিসে অশোকবাবুর কাছে নিয়ে যাও।

অশোকদা সুদীপকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ওকে জড়িয়ে ধরেন। বলেন, তুই দিল্লী থাকিস না?

হ্যাঁ।

তা এখানে কী করতে এসেছিস?

সুদীপ হেসে বলে, তুমি কী শুধু এইসব ওয়ার্কারদের লীডার?

তুমি আমার লীডার না ?

অশোকদা সুদীপকে দেখিয়ে ঘর ভর্তি লোককে বলেন, আমার দাদার খুব প্রিয় ছাত্র, তাছাড়া আমার এক নম্বর চেলা।

সুদীপের সমাদরের কোনো ত্রুটি হল না। চা-নিমকি-সিঙাড়া-রসগোল্লা এলো। খাওয়া-দাওয়ার পর অশোকদাকে নিয়ে বাইরে এসে সুদীপ ওর আসার কারণ খোলাখুলিভাবেই বলল।

কিন্তু আমি কী করতে পারি বল ?

তুমি সবকিছু পারো।

তুই যখন সবই জানিস তখন বল, আমি কী করে তোকে হেল্প করতে পারি ?

সুদীপ বলে, তুমি পারমিশন দিলে আমি কোম্পানির অফিসার, ক্যান্টিন কণ্ট্রাক্টর আর ইউনিয়নের মেম্বারদের সামনে একটা প্রস্তাব দেব।

কী প্রস্তাব ?

আমাদের কোম্পানীর জন্য এই ফ্যাক্টরীতে বছরে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ লাখ টাকার কাজ হয়।···

তা আর জানি না ? সব জানি।

সুতরাং এই ফ্যাক্টরীর লেবারদের সঙ্গে আমাদেরও একটা সম্পর্ক আছে।

অশোকদা মাথা নেড়ে বলে, তা তো বটেই।

এবার সুদীপ একটু হেসে বলে, এই ফ্যাক্টরীর সমস্ত লেবার ও কর্মীদের জন্য যদি আমাদের কোম্পানি থেকে ক্যান্টিনের সমস্ত নতুন ফার্নিচার আর স্টেনলেস স্টিলের বাসন কিনে দেয়····

ও কথাটা শেষ করার আগেই অশোকদা অবাক হয়ে বলে, তুই কী বলছিস।

তোমার শ্রমিকদের প্রতি শুভেচ্ছা জানাবার জন্য যদি আমরা এইসব জিনিস····

কিন্তু সে তো অনেক টাকার ব্যাপার ? তোর অটোয়াল সাহেব যদি শেষে রাজী না হন ?

সুদীপ হেসে বলে, যদি তোমাকে আর ক্যান্টিন কন্ট্রাক্টরকে নিয়ে এখনই আসানসোল মার্কেট থেকে আমি সবকিছু কিনে দিই ?

অশোকদার মুখে আর কথা নেই। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে, তাহলে এই দুটোর শিফটই আমি কারখানা চালু করে দিতে পারি।

তবে একটি শর্ত।

কী শর্ত ?

সবার আগে আমাদের পেণ্ডিং কাজটা করে দিতে হবে।

ডেফিনিটলি !

সত্যি অশোকদা দুটোর শিফট চালু করে দিলেন। তারপর আসানসোল স্টেশনের কাছে জি. টি. রোডের ওপরকার দোকান-গুলোতে ঘণ্টা দুয়েক ঘোরাঘুরি করেই সব কেনা হল। স্টিলের পঁচিশটা ফোল্ডিং টেবিল, একশ'টা ফোল্ডিং চেয়ার, স্টেনলেস স্টিলের থালা-গেলাস-বাটির একশ' সেট। লরী বোঝাই করে মালপত্র কারখানায় ঢুকতেই সে কী উল্লাস! হামারা প্রেসিডেণ্ট অশোক মুখার্জী! যুগ যুগ জীও! যুগ যুগ জীও!

দিল্লী কা অটোয়াল সাহাব!

জিন্দাবাদ!

দিল্লী কা অটোয়াল সাহাব!

জিন্দাবাদ!

দিল্লী কা অটোয়াল সাহাব!

জিন্দাবাদ!

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড এক্সপ্রেসে কলকাতা রওনা হবার আগে সুদীপ মিঃ শর্মাকে বলল, এখুনি দিল্লীতে একটা টেলেক্স পাঠিয়ে দেবেন ?

মিঃ শর্মা জবাব দেবার আগেই অশোকদা গম্ভীর হয়ে বলেন, হ্যাঁ লিখে নিন, স্ট্রাইক উইথড্রন বিকজ অফ সুদীপ্ত সরকারস্ ইণ্টারভেশন স্টপ আওয়ার কোম্পানি অ্যাণ্ড ইউনিয়ন এক্সট্রিমলি গ্রেটফুল টু ইওর

কোম্পানি এইসব স্টীলের চেয়ার-টেবিল ও স্টেনলেস স্টীলের বাসন-কোসন কিনে দেবার জন্য স্টপ কন্ট্যাক্ট মিঃ সরকার লেট নাইট ফর ডিটেলস্।

মিঃ শর্মা একগাল হাসি হেসে বললেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে মেসেজ দিল্লী পৌঁছে যাবে।

শুধু অশোকদা না, লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার মিঃ ঘোষ ও ইউনিয়নের একদল পাণ্ডা আর ক্যান্টিন কণ্ট্রাক্টর আসানসোল স্টেশনে গিয়ে সুদীপকে ট্রেনে চড়িয়ে দিল।

হোটেলের ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই অটোয়াল সাহেবের ফোন, সুদীপ্তবাবু, শর্মার টেলেক্স পেয়েছি। আই অ্যাম রিয়েলি ভেরি হ্যাপি ফর ইওর ম্যাগনিফিসিয়েন্ট এ্যাচিভমেন্ট।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!

অটোয়াল হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেন, কী ম্যাজিক দেখালেন?

সুদীপ সবকিছু বলার পর বলল, একদিকে সবকিছু মিলিয়ে বিচ্ছিরি জট পাকিয়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ভেরি হেল্পফুল হলেও দশ-বারোজন পাণ্ডাকে ঠাণ্ডা করতেই আমি হিমসিম খেয়ে গেছি।

তারপর কী করলেন?

স্যার, আমি ড্রামাটিক অফার দিলাম। ইউনিয়নের ঐ দশ-বারোজন পাণ্ডাকে একটু আলাদা নিয়ে পুরো এক ওদের হাতে তুলে দিয়ে বললাম, আপনারা ক'জনে ভাগ করে নিন। আর অন্যদিকে এ্যাজ এ গুড উইসেস ফ্রম আওয়ার কোম্পানি পঁচিশটা স্টীলের ফোল্ডিং টেবিল, একশ'টা ফোল্ডিং চেয়ার আর স্টেনলেস স্টীলের একশ' সেট থালা-গেলাস-বাটি কিনে ক্যান্টিনে প্রেজেন্ট করেছি।

ভেরি গুড!

স্যার, এইসব কিনতে সাঁইত্রিশ হাজার খরচ হল।

ঠিক আছে, ঠিক আছে।

স্যার, তার মানে ওখানে আমার টোট্যাল ব্যয় হয় এক সাঁইত্রিশ।

পারফেক্টলি অল রাইট!

স্যার, এইসব কিছু করেছি একটি শর্তে।

শর্ত আবার কী?

স্যার, আজ দুটোর শিফট্ থেকেই আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেছে। দিন চার-পাঁচের মধ্যেই ওরা মাল ডেসপ্যাচ করে দেবে।

বলেন কী সুদীপ্তবাবু?

হ্যাঁ স্যার, ইউনিয়ন আর কোম্পানি দু'দলই আমার শর্ত মেনে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

অটোয়াল সাহেব বললেন, যে তেতাল্লিশ আপনার কাছে আছে, তা আর ফেরত দিতে হবে না।

কী বলছেন স্যার?

ইয়েস সুদীপ্তবাবু, ইউ নিড নট রিটার্ন দ্যাট।

উনি একটু থেমে বলেন, তবে কাউকে এ কথা জানাবেন না।

সুদীপ মুহূর্তের জন্য বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে।

কী হলো সুদীপ্তবাবু? কথা বলছেন না কেন?

না স্যার, আমি ভাবতে পারছি না।

কিছু ভাবতে হবে না, কালই কোথাও একটা স্মল প্লট অফ ল্যাণ্ড কিনে নিন। টাকাটা নষ্ট করবেন না।

না স্যার! নষ্ট করব না। একটু থেমে ও বলে, স্যার, আমি যদি কাল বিকেলের ফ্লাইটে যাই, তাহলে কী····

অটোয়াল সাহেব অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, না, না, কাল আসতে হবে না। আপনি দু'তিন দিন পর আসুন কিন্তু জমি না কিনে আসবেন না। একটু থেমে বলেন, আর ইউ ক্যান ডু এ্যানাদার থিং। কোন একটা ফ্ল্যাট বুক করুন।

ঠিক বলেছেন স্যার।

মোট কথা টাকাটা নষ্ট করবেন না।

না স্যার, আমি কথা দিচ্ছি, টাকাটা নষ্ট করব না।

টেলিফোন রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই হঠাৎ সুদীপের মাথাটা ঘুরে যায়। কোনমতে টেবিলের কোণটা ধরে দু'এক পা এগিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। দু'এক মিনিট পরই ও উঠে বসে। দাঁড়ায়। আবার শুয়ে পড়ে। আপন মনে হাসে। মুহূর্তের জন্য ইচ্ছে হয়, চৌরঙ্গীর দিকের জানলায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সমস্ত কলকাতার মানুষকে জানিয়ে দেয়, বোসপাড়ার সেই বেকার সুদীপ্ত সরকার এক লাখ তেতাল্লিশ হাজার টাকার মালিক। কী কালোদা, আর আমাকে অমন টিটকিরি দিয়ে কথা বলবে? এই যে উকিলবাবুর মেয়ে, একদিন একটু ঠাট্টা করেছিলাম বলে তুমি কী অপমান করেছিলে মনে আছে? তোমার প্রতি কোনকালেই আমার কোন দুর্বলতা ছিল না, আজও নেই। সত্যি কথা বলতে কি, মালার সঙ্গে আমার খুবই ভাব ছিল কিন্তু ভালবাসা ছিল কী? ও অমন করে চেপে না ধরলে হয়তো আমি কোনকালেই বিয়ে-থা করতাম না। তবে আমি তো দেবতা না। তাছাড়া যৌবনের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে।....

হা ভগবান! উকিলবাবুর ঐ অহঙ্কারী মেয়েকে কী বলতে কী বলছি। বেড়াল যেমন আধমরা নেংটি ইঁদুর নিয়ে খেলা করে, আজ এই দেড় লাখ টাকা দেখিয়ে কী তোমাকে নিয়ে সেইরকম খেলতে পারি না?

আরো কত কি ওর মনে আসে। কত সুখ-দুঃখের ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তারপর হঠাৎ শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে পাগলা ঘোড়ার মত রক্ত দৌড়দৌড়ি করতে শুরু করে। ইচ্ছে হয় বিলাস-ব্যসন-সম্ভোগের চূড়ান্ত পর্যায় দেখতে।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে।

হ্যালো! ইয়েস যোশীজী বলুন।....থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ! সবই আপনার আশীর্বাদ।....হ্যাঁ, অটোয়াল সাহেবকে বলেছি, দু'একটা জরুরী কাজ সেরে দু'একদিন পর আসছি।....কী যে বলেন আপনি?

আমি হিরো হতে চাই না। আমি আপনার চেলা হতে চাই।.... আচ্ছা গুড নাইট।

যোশীজীর সঙ্গে কথা বলা শেষ করে টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখতেই ওর হঠাৎ খেয়াল হয়, ও খুব ক্লান্ত ও ক্ষুধার্তও। ক্লান্ত হবে না কেন? কাল সেই সাত সকালে উঠে ফ্যাক্টরী রওনা হবার পর থেকে কি অমানুষিক পরিশ্রম আর অকল্পনীয় উৎকণ্ঠা উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে দুটো দিন কাটল! বাপরে বাপ! ভাবলেও গা শিউরে ওঠে! ঠিক যেন রেসের ঘোড়া! মরে গেলেও ক্ষতি নেই কিন্তু মরবার আগে বেসে জেতা চাই। জিততেই হবে।

যদি আসানসোলে ব্যর্থ হত, তাহলে সুদীপ কী যোশীজী বা মিঃ অটোয়ালের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতো? কখনই না।

আসানসোল থেকে আসার সময় ট্রেনে কত প্যাসেঞ্জার অকাতরে ঘুমুচ্ছিলেন। সুদীপেরও কি ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু ব্রীফকেস ভর্তি টাকা থাকলে কী ঘুমনো যায়?

স্নান করতে যাবার আগে স্যাণ্ডউইচ, কাজু আর দুটো হুইস্কীর অর্ডার দিল।

স্নান করে দুটো-একটা স্যাণ্ডউইচ আর খানিকটা হুইস্কী পেটে যাবার পর সুদীপ যেন আবার প্রাণ ফিরে পায়। একটা সিগারেট ধরিয়ে দু'একটা টান দেবার পরই রিসিভার তুলে ডায়াল ঘুরিয়ে অপারেটরকে গেস্ট হাউসের নম্বরে কল বুক করতে বলে। কী? লাইটনিং কল? হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাইটনিং কলই বুক করুন।

দু'মিনিট পরই টেলিফোন বেজে ওঠে। অপারেটর বলে, স্যার, ট্রাঙ্ক অপারেটর এখুনি আপনাকে লাইন দেবে। আপনি একটু হোল্ড করুন।

সত্যি, এক মিনিট পরই গেস্ট হাউসের টেলিফোন বেজে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিমান বলে, হ্যালো!

আমি সুদীপ! তুই ঘুমোসনি?

আমি তো জানি, তুই টেলিফোন করবি, তাই জেগে আছি।

কী করে জানলি টেলিফোন করব ?

আসানসোল থেকে টেলেক্স আসার পর অটোয়াল সাহেব ওয়াজ সো হ্যাপি যে তোকে এখানে আনার জন্য উনি আমাকে কত যে ধন্যবাদ জানালেন····

সুদীপ হঠাৎ চুড়ির শব্দ শুনতে পায়। বলে, মালা কী জেগে আছে ?

বিমান একটু হেসে বলে, এই রাত সাড়ে বারোটার সময় মালাকে কোথায় পাব রে ? ও তো ওপরে ঘুমুচ্ছে।

ক্ষীণ একটা হাসির শব্দ সুদীপের কানে আসে। মনে হল যেন মালাই মুখ টিপে হাসছে। তবু মুখে বলে, না, ভাবলাম, হয়তো তোরা আড্ডা দিচ্ছিস।

তুই নেই বলে চৌকিদার আর দশরথ শুতে যাবার আগেই মালা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে।

আবার সেই মুখ চেপে হাসির শব্দ ! সুদীপের একটু খটকা লাগে। সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রশ্ন করতে পারে না।

বিমান বলে, কাল কোন্ ফ্লাইটে আসছিস ?

না, না, আমি কাল আসছি না। অটোয়াল সাহেবের দু'একটা ছোট-খাটো কাজ আছে। আমারও একটু কাজ আছে।

তাহলে কবে আসছিস ? খুব দেরি করে আসবি শুনলে হয়তো তোর আদুরে বউ কাঁদতেই শুরু করবে।

এবার হাসির শব্দ একটু স্পষ্টই শুনতে পায় সুদীপ। বুঝতে কষ্ট হয় না মালাই হাসছে। তবে বিমানকে বলে, ও কাঁদলে তুই চোখের জল মুছিয়ে দিবি। তবে যাইহোক ওকে বলে দিস, আমার আসতে চার-পাঁচদিন দেরি হবে।

চার-পাঁচদিন ?

তার আগে বোধহয় কাজ শেষ করতে পারবো না।

যাইহোক আসার আগে টেলিফোন করিস। আমি মালাকে নিয়ে

এয়ারপোর্ট যাব।

সুদীপ মুখে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানাব কিন্তু মনে মনে ঠিক করে, নৈব নৈব চ! রওনা হবার আগে কখনই তোদের খবর দেব না।

হঠাৎ সুদীপের সারা মন বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে। বিস্বাদ লাগে হুইস্কী, সিগারেট। সবকিছু। একসঙ্গে হাজার প্রশ্ন আর দ্বন্দ্ব দেখা দেয় মনে। মুহূর্তের জন্য মনে হয়, এই মুহূর্তে ছুটে চলে যায় দিল্লী। এই রাত্তিরেই সবকিছু ফয়সালা হয়ে যাক।

ঢক করে আধ গেলাস হুইস্কী গলায় ঢেলে দেবার পরই সুদীপ আপন মনে হাসে। ব্রীফকেস খুলে এক লাখ তেতাল্লিশ হাজার টাকা দেখতেই সব রাগ কোথায় যেন উড়ে যায়। অর্থ মানুষকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়, প্রভাব-প্রতিপত্তি-মর্যাদাও দিতে পারে কিন্তু বোধহয় ছিনিয়ে নেয় মনের শান্তি আর চরিত্র।

॥ নয় ॥

অত ক্লান্তি নিয়ে ঐ রাত্তিরে ঘুমুতে গেলেও খুব ভোরবেলায় সুদীপের ঘুম ভেঙে গেল। গত রাত্রের দুঃস্বপ্নের ঘন কালো মেঘ কোথায় হারিয়ে গেছে। জানলা দিয়ে ময়দানের আকাশের দিকে তাকাতেই সুদীপের চোখের সামনে ভেসে উঠল ওর মায়ের মুখখানা। কি আশ্চর্য মমতাময়ী মহিলা! কত দুঃখ-কষ্ট অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়ে সারাজীবন সংসার করলেন কিন্তু তবু একটু ভাল-মন্দ রান্না হলে এ বাড়ি-ও বাড়িতে না দিয়ে মুখে তুলতে পারেন না। একটু কচুর শাক বা কপির ডাঁটার চচ্চড়ি হলেই অর্ধেক ভাত খাওয়া হয়ে যায়। নিজের শাড়ির তলায় সায়া নেই কিন্তু স্বামীর জামাটা ছিঁড়ে গেলেই এদিক-ওদিক হাতড়ে পঁচিশ-তিরিশটা টাকা বের করে সুদীপের হাতে দিয়ে বলেছেন, হ্যাঁরে, তোর বাবার শার্টটা ছিঁড়ে গেছে। শোভাবাজার থেকে তোর বাবার জন্য একটা শার্ট এনে দিবি?

বাবার তো দু'তিনটে শার্ট ভালই আছে। তার চাইতে তুমি

দুটো-একটা সায়া কিনে নাও।

মা হেসে বলেছেন, ওরে, আমি তো বাড়ির মধ্যেই থাকি আর তোর বাবাকে তো পাঁচ জায়গায় যেতে হয়।

এ সংসারে যারা মস্তক মুণ্ডন করে গেরুয়া ধারণ করেন, তারাই নাকি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী কিন্তু আমাদের ঘরে ঘরে যে মায়েরা নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিলাস-ব্যসন চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়ে পাঁচজনের সেবায় আত্মনিবেদন করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন, তারা কী আরও বড়, আরও শ্রদ্ধেয়া নয়? এদের আত্মত্যাগের কাহিনী চিরকাল উপেক্ষিত হচ্ছে। কোনো পণ্ডিত অধ্যাপক বা সমাজ-বিজ্ঞানী জানতে চেষ্টা করলেন না, এই অশিক্ষিতা মায়ের দল বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে পা না দিয়েও কীভাবে মানব ধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শে দীক্ষিত হয়ে সারা জীবন উৎসর্গ করলেন।

সুদীপ আর এক মুহূর্ত শুয়ে থাকতে পারে না। মাকে একটু কাছে পাবার জন্য ও যেন পাগল হয়ে ওঠে।

সুদীপকে দেখে ওর বাবা অবাক হলেও ওর মা একটুও অবাক হলেন না। সেই চির-পরিচিত স্নিগ্ধ শান্ত হাসি হেসে বললেন, কাল থেকে দু'তিনবার মনে হয়েছে ঐ ছাদের ঘর থেকে তুই যেন মা মা বলে ডাকছিস।

সুদীপ দু'হাত দিয়ে মাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি মনে মনে আমাকে ডেকেছ বলেই তো আমি ছুটে এলাম।

ভালই করেছিস। সত্যি, তোকে দেখকে বড্ড ইচ্ছে করছিল।

বাবা হাজার প্রশ্ন করেন, কোন ট্রেনে এলি, ক'দিন থাকবি, মালাকে আনলি না কেন, প্রদীপের চিঠি পেয়েছিস কিনা, অভীক কী দিল্লী গিয়েছে। আরও কত কি!

সুদীপ তার আসা-যাওয়ার কারণ ও হোটেলে থাকার কথা বলতেই উনি চমকে ওঠেন, অ্যাঁ! তুই বাড়িতে না থেকে গ্রাণ্ড হোটেলে ছিলি?

বিশেষ কারণের জন্যই অফিস আমাকে ওখানে রেখেছে। তাছাড়া

যখন তখন টেলিফোন-টেলেক্স আসতে পারে ও আসছে বলেই····

মা জিজ্ঞেস করলেন, সকালে কিছু খেয়েছিস ?

তোমার কাছে আসছি আবার খেয়ে আসব কেন ?

চিড়ে-দুধ-কলা মেখে দিই ?

সুদীপ একটু হাসে। সম্মতির হাসি। খুশির হাসি। মায়ের মেখে দেওয়া চিড়ে-দুধ-কলা যে ওর বড় প্রিয়।

মার হাত থেকে বাটিটা নিয়ে এক চামচ মুখে দিয়েই সুদীপ হাসতে হাসতে বলে, জানো মা, তোমার মাখা চিড়ে-দুধ এক্সপোর্ট করলে বোধহয় ইণ্ডিয়া হাজার কোটি টাকা আয় করতে পারে।

ওর কথা শুনে মা না হেসে পারেন না। বলেন, চুপ কর! আমার চিড়ে মাখা তোর ভাল লাগে বলে কী সবার ভাল লাগবে ?

তাজমহলের সৌন্দর্য যেমন সবার ভাল লাগে, তেমনি তোমার চিড়ে মাখাও সবার ভাল লাগতে বাধ্য।

ছেলের কথা শুনে উনি হেসে ওঠেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তুই দুপুরে খাবি তো ?

নিশ্চয়ই খাব তবে কখন আসব তা বলতে পারছি না। অনেক জায়গায় আমার দৌড়দৌড়ি করতে হবে।

তুই আজই ফেরত যাবি ?

যদি কাজ শেষ হয় তাহলে নিশ্চয়ই চলে যাব।

মালাদের বাড়ি যাবি না ?

যখন দুপুরে খেতে আসব তখন একবার মালাদের বাড়ি আর বিমানের মার কাছে যাব।

সুদীপ আর দেরি করে না। বেরিয়ে পড়ে।

দত্তদা আর বৌদি ওকে দেখেই বলেন, আমাদের চিঠি তাহলে ঠিক সময়েই পেয়েছ ?

সুদীপ অবাক হয়ে বলে, মাসখানেকের মধ্যে তো আপনাদের কোনো চিঠি পাইনি।

দাদা বললেন, দিন সাতেক আগে তোমার ফ্যাক্টরীর ঠিকানায় যে চিঠি দিয়েছি, তা পাওনি ?

না।

হা ভগবান !

বৌদি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আজ তুমি হঠাৎ এলে কেন ?

অফিসের খুব জরুরী কাজে আসানসোল গিয়েছিলাম বলে····

দাদা বললেন, যাইহোক তুমি যখন এসে পড়েছ তখন খুবই ভাল কথা। একটা খুব ভাল খবর আছে।

বৌদি বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও. চা করে এনে আমিই ওকে বলছি। দাদা একটু হেসে বললেন, বেশ বেশ তুমিই বলো।

ছোট ট্রে করে তিন কাপ চা এনে সেণ্টার টেবিলে রাখার পর মোড়াটা টেনে নিয়ে সুদীপের পাশে বসেই বৌদি একটু হেসে বলেন, সবার আগে কথা দাও, আমরা তোমাকে পরামর্শ না করেই যা করেছি, তা তুমি মেনে নেবে।

আমার বিষয়ে কোনো ডিসিশন নিয়েছেন ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার বিষয়ে।

সুদীপ একটু হেসে বলে, আপনারা দুজনে স্বচ্ছন্দে আমার বিষয়ে যে কোনো ডিসিশন নিতে পারেন।

বৌদি এবার বলেন, তোমার দাদার জানাশুনো কিছু বিশিষ্ট ভদ্রলোক বেহালায় একটা হাউসিং কো-অপারেটিভ করেছেন। পাশাপাশি দুটো চারতলা বাড়ি হচ্ছে। এক একটা বাড়িতে ষোলটা করে ফ্ল্যাট।····

সুদীপ না হেসে পারে না।

বৌদি বলে যান, ঐ বত্রিশজন মেম্বারের মধ্যে দুজন সল্টলেকে জমি না বাড়ি কি যেন পেয়েছেন বলে ওরা ঐ কো-অপারেটিভের মেম্বারশিপ ছেড়ে দেন। এদিকে বাড়ি প্রায় তৈরি।

সুদীপ এবার প্রশ্ন করে, ঐ দুটো খালি জায়গায় কী আমরা দাদা-ভাই ঢুকছি ?

দাদা বললেন, হ্যাঁ, সেই ব্যবস্থাই করেছি।

সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে দাদা-বৌদিকে প্রণাম করে ব্রীফকেসটা খুলে ধরে।

দাদা-বৌদি দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে যান। বিস্ময় কাটার পর বৌদি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কী ফ্ল্যাট কিনতেই কলকাতা এসেছ?

সুদীপ ওর আসানসোল যাবার কাহিনী জানিয়ে বলে, ওখানে যদি আমি সমস্যাটা না মেটাতে পারতাম, তাহলে পুরো এক্সপোর্ট কনট্রাক্টই বাতিল হয়ে যেত এবং কোম্পানীর লোকসান হতো চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ টাকা।

দাদা বললেন, তার মানে ইট ওয়াজ এ প্রেটি সিরিয়াস প্রবলেম্।

হ্যাঁ দাদা। সুদীপ একটু হেসে বলল, এত সহজে আর এত কম খরচে আমি সমস্যাটা সলভ্ করতে পেরেছি বলে অটোয়াল সাহেব ব্যালান্স টাকাটা আমাকে দিয়ে দিয়েছেন।

ওয়াণ্ডারফুল!

বৌদি বললেন, ভদ্রলোক তো তোমাকে দারুণ ভালবাসেন!

সুদীপ বলে, বৌদি, অটোয়াল সাহেব কাল রাত্তিরে আমাকে বার বার বলেছেন, টাকাটা নষ্ট না করে অন্তত এক টুকরো জমি কিনতে।

দাদা বললেন, অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষীর মত সৎ পরামর্শই দিয়েছেন।

সুদীপ একটু হেসে বলে, কিন্তু বৌদি, কাল রাত্তিরে কয়েক মিনিটের জন্য আমি বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর অটোয়াল সাহেবের কথা মনে হতেই ঠিক করলাম, আপনাদের কাছে টাকাগুলো রেখে চলে যাব।

বৌদি বললেন, ভাগ্যে না থাকলে কারুর জমি-জমা ঘর-বাড়ি হয় না। তোমার ভাগ্যে আছে বলেই ওদিকে হঠাৎ কো-অপারেটিভের মেম্বার হতে পারলে আবার এদিকে আশ্চর্যভাবে এই টাকাগুলো পেয়ে গেলে।

দাদা-বৌদি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সুদীপের নামটা কো-অপারেটিভের খাতায় তুলিয়ে দিয়েছিলেন। এখন যথারীতি ফর্ম-

টর্ম ভর্তি করা হলো। এক লাখ আশী হাজার করে ফ্ল্যাটের দাম কিন্তু যেহেতু ফ্ল্যাট তৈরী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এখনই অন্তত নব্বই হাজার দিতে হবে, বাকী নব্বই হাজার টাকা এ্যাপেক্স বডিকে তিন বছরে শোধ দিতে হবে। তবে দাদা-বৌদি অফিস থেকে এক লাখ কুড়ি থেকে চল্লিশ হাজার লোন পাবেন বলে ঐ টাকাটাই ওরা দিয়ে দেবেন। দাদা বললেন, তুমিও এক লাখ কুড়ি হাজার দিয়ে দাও। বাকী ষাট হাজার তিন বছরের মধ্যে দিলেই হবে।

কিন্তু দাদা, এই কালো টাকা কী করে জমা দেবেন ?

সে ব্যবস্থা আমি করব, তোমাকে ভাবতে হবে না।

সব শেষে সুদীপ বলল, আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ।

কী ? বৌদি জিজ্ঞেস করেন।

আমার এই ফ্ল্যাটের কথা যেন কেউ না জানে।

কেন ? বৌদি অবাক হন, মালাকেও জানাবে না ?

সুদীপ হেসে বলে, বৌদি সব মেয়ে কী আপনার মত হয় ? ও একটু থেমে বলে, অর্থের প্রতি মালার বড় লোভ, বড় দুর্বলতা। ছোট-খাটো আনন্দে ও বড় তাড়াতাড়ি ভেসে যায়। এই ফ্ল্যাটের কথা জানলে, ও বোধহয় নিজের বাবা-মা'কেও ভুলে যাবে।

দাদা-বৌদি সঙ্গে সঙ্গে কোনো কথা বলতে পাবেন না, চুপ করে থাকেন।

সুদীপ বলে যায়, এই ফ্ল্যাট পাবার পর আপনারা একটা ভাল পরিবারকে ভাড়া দেবেন, আপনারাই ভাড়া আদায় করবেন, আপনারাই ব্যাঙ্কে জমা রাখবেন। তারপর কার কখন কোন বিপদ আসে বা প্রয়োজন দেখা দেবে, তা তো বলা যায় না।

দাদা বললেন, আচ্ছা, সেসব পরে ভেবে দেখা যাবে কিন্তু ফ্ল্যাটটা দখল নেবার জন্য তোমাকে তো একবার আসতে হবে।

কবে ?

এই মাস দুয়েক পর।

আপনি ফ্যাক্টরীর ঠিকানায় একটা টেলিগ্রাম করবেন, আমি

চলে আসব।

সুদীপ দেখতে চায় নি কিন্তু দাদা-বৌদি দু'জনেই ওকে জোর করে ফ্ল্যাটটা দেখাতে নিয়ে গেলেন। নতুন ডায়মণ্ডহারবার রোডের ওপর পাশাপাশি দুটি বাড়ি। মাঝখানে বেশ খানিকটা জমি। ফ্ল্যাটগুলি সত্যি ভাল। প্রচুর আলো-বাতাস। সুদীপ বলল, বৌদি, দাদা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি আর আপনি এই বারান্দায় বসে সারা রাত গল্প করব।

দাদা একটু হেসে বলেন, তা তোমরা পারো। তোমরা দু'জনে যে কত কথা বলতে পারো, তা আমি ভেবে পাই না।

বৌদি বললেন, কেউ তোমাকে ভাবতে বলছে না।

সুদীপ হেসে ওঠে।

মানুষের জীবনে কখনও কখনও এমন দিন, এমন সময় আসে, যখন একের পর এক সাফল্য আর আনন্দের ঢেউ আসে। এখন সুদীপের সেই অবিস্মরণীয় অধ্যায় এসেছে।

দিল্লীতে মালার জীবনেও এক অবিস্মরণীয় পর্ব চলছে।

সেদিন সাড়ে সাতটা নাগাদ সুদীপের প্লেন ছাড়ার পরই যোশীজী বাড়ি চলে গেলেন। বিমান মালাকে জিজ্ঞেস করল, এখনই গেস্ট হাউসে ফিরবে?

না, না, চলো একটু কোথাও ঘুরে যাই। আমি তো দিল্লীর কিছুই দেখি নি।

বিমান একটু হেসে চাপা গলায় বলে, আজ তো লুকোচুরি খেলতে হবে না। সত্যিই তো এত তাড়াতাড়ি গেস্ট হাউসে ফিরে কী হবে। গাড়িতে উঠেই মালা বলল, তুমি ড্রাইভারকে না নিয়ে এসে ভালই করেছ।

বিমান বাঁ হাতের একটা আঙুল দিয়ে নিজের মাথায় টোকা মেরে বলে, ড্রাইভারকে না নিয়ে আসা তো তুচ্ছ ব্যাপার। আমি অনেক

হিসেব-নিকেশ করে তবে তোমার স্বামীকে কল্যাণী থেকে এখানে টেনে এনেছি।

আগে বুঝতে না পারলেও এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তা আমি বুঝতে পেরেছি।

পালাম রোড ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে বিমান বলে, আমি খুব ভাল করেই জানতাম, তুমি সুদীপের মত গুড়ি গুড়ি ছেলেকে বিয়ে করে খুশি হতে পারবে না।

সত্যি, ও যে কেন এত ঘরকুনো আর কনজারভেটিভ, তা আমি ভেবে পাই না।

ও টিপিক্যাল বোসপাড়া মডেল। ওর মধ্যে লাইফ বলে কিছু নেই।

মালা বলে, ও মানুষটা খারাপ না কিন্তু কখনই প্রাণভরে আনন্দে মেতে উঠতে পারে না। আমার আবার ঠিক উল্টো নেচার।

ধোলাকুয়া ছাড়িয়ে রিং রোড ধরে খানিকটা যাবার পরই বিমান বলে, চল, আজ আমরা হোটেলে খেয়েদেয়ে গেস্ট হাউসে ফিরব।

খুব ভীড়ের মধ্যে গেলে কথা বলা যাবে না।

চলো, আকবরে যাই। দ্যাটস এ লাভলি প্লেস।

গাড়ি পার্ক করে আকবর হোটেলে লবীতে ঢুকেই মালা একটু চাপা গলায় বলল, কী বিউটিফুল!

তোমাকে নিয়ে কী আজেবাজে জায়গায় যেতে পারি? বিমানও চাপা গলায় বলে ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসে।

তবে এ-কথা আমি মানতে বাধ্য, তোমার রুচি আছে।

একটু রুচি না থাকলে কী তুমি আমাকে বরদাস্ত করতে?

কফি শপে ঢুকতে গিয়েও বিমান থমকে দাঁড়িয়ে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, মালা, আটটা বেজে গেছে। এখন আর কফি না খেয়ে চল ডিনার খাই।

চল।

ডিনার খেতে গিয়েই বিমান একটু হেসে বলে, আজ আর তোমাকে জিন বা হুইস্কী খাওয়াবো না।....

তবে কী খাওয়াবে ?

বিমান একটু চাপা হাসি হেসে একটু টেনে টেনে বলল, ফা-স্ট ক্লা-শ ফ্রে-ঞ্চ ও-য়া-ই-ন !

কেন অযথা এত খরচা করবে ? মালা ওর দিকে তাকিয়ে বলে, না, না, ওসব কিছুর দরকার নেই। যা হোক একটু কিছু খেয়ে চল গেস্ট হাউসে যাই। ওখানে জমিয়ে গল্প করা যাবে।

বিমান একটু কাছে এগিয়ে এসে বলল, মালা, এ সংসারে বেশি হিসেবী হলে আনন্দ পাওয়া যায় না। বাড়িতে পোলাও-কালিয়া খাওয়ার চাইতে পিকনিকে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে করতে শুধু খিচুড়ি খেয়ে অনেক বেশি আনন্দ, তাই না ?

মালা মুখে বলতে পারে না কিন্তু মনে মনে বলে, মেয়েরা ভালবেসে বিয়ে করতে চায়, ঘর বাঁধতে চায়, মনের মত সংসার গড়ে তুলতে চায়। এ সবই সত্যি। কিন্তু তার চাইতে বড় সত্যি হল, মেয়েরা পুরুষের কাছে শৌর্যবীর্য চায়, (চায় বেহিসেবী ভালবাসা)। উদ্দাম প্রাণ প্রাচুর্য। গঙ্গা-গোদাবরী পবিত্র হতে পারে কিন্তু পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র মানুষের মনে অনেক বেশি দোলা দেয়, কাব্য-সাহিত্যের পাতায় পাতায় তার উল্লেখ।

ও শুধু একটু হেসে বলল, তোমার মধ্যে অমন উদ্দাম প্রাণ প্রাচুর্য আর বেহিসেবী ভালবাসা আছে বলেই তো আমি ভেসে গেলাম।

খেতে খেতেই বিমান ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। মালা আবার বলে, দীপকে আমি সত্যি ভালবাসি। ওকে কেন ভালবাসব না বল ? সত্যিই তো ও ভাল ছেলে কিন্তু আমি তো শুধু ওর স্ত্রী হতে চাইনি।

বিমান অবাক হয়ে ওর কথা শোনে।

আমি চেয়েছিলাম, ওর বন্ধু হতে, ওর আনন্দের অংশীদার হতে। মালা একটু থেমে বলে, সব মেয়ে কী শুধু শাঁখা-সিঁদুর আর মাঝে মাঝে স্বামীর কাছে দেহটা বিলিয়ে দিয়েই শান্তি পায়, নাকি সুখী হতে পারে ?

বিমান আবার একটু হাসে।

মালা একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, তুমি হাসছ বিমানদা? আমার মত বয়সে কোন্ মেয়ে চায় না যে তার স্বামী তাকে নিয়ে একটু মাতামাতি করুক? এই মন, এই বয়স, এই যৌবন কী চিরকাল থাকবে? THAT'S RIGHT!

সেদিন রাত্রে মালা দোতলায় নিজের ঘরে শোয়নি। চৌকিদার আর বেয়ারা রঘুবীর পিছন দিকে নিজেদের কোয়ার্টার্সে চলে যাবার পর মালা জামা-কাপড় বদলে পিঙ্ক রংয়ের নাইটি পরে নিচে নেমে এসেছিল।

বিমান ওকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, এমন রাত তো কোনদিন আসেনি, হয়তো আর আসবেও না। সো লেট আস এনজয় এভরি মোমেণ্ট অফ দিস বিউটিফুল নাইট।

মালা হাসে।

বিমান দুটো ড্রিঙ্ক রেডি করে একটা গেলাস ওর দিকে দেয়

আবার?

ইয়েস! ফর দিস মেমোরেবল নাইট!

একটা রাউণ্ড শেষ হবার পর দ্বিতীয় রাউণ্ড শুরু হতেই মালা বলে, আচ্ছা বিমানদা, একটা সত্যি কথা বলবে?

নিশ্চয়ই বলব।

আমাকে তুমি খুব খারাপ ভাব, তাই না?

খারাপ ভাবব কেন?

বাঃ! আমি তোমার বন্ধুর স্ত্রী হয়েও তোমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করি, চুরি করে প্রেম করি, স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে বাদখালে তোমাকে দেহ দিয়েছি, হয়তো আজও দেব, তবু আমাকে খারাপ মনে হয় না?

কথাগুলো বলতে বলতেই মালার দুটো চোখ ছল ছল করে ওঠে।

বিমান হাতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে মালাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, এ সংসারে দুর্বলতা আছে বলেই তো আমরা মানুষ। সবাই কী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ হয়? নাকি হওয়া সম্ভব?

কিন্তু তাই বলে কী সব মেয়েই আমার মত নিজেকে এভাবে বিলিয়ে দেয় ?

বিমান একটু হেসে বলে, এ সংসারে কোন্ মানুষের দুর্বলতা নেই ? ষোল আনা সৎ মানুষ কী সংসারে বাস করতে পারে ? ও একটু থেমে বলে, যার মধ্যে সামান্যতম দুর্বলতা আছে, যে মুহূর্তের জন্যও অসৎ হয়, সেই তো চরিত্রহীন।

তা ঠিক কিন্তু····

বিমান মালাকে টেনে নিয়ে কোলের উপর শুইয়ে ওর মুখের সামনে মুখ নিয়ে বলে, যে পলিটিসিয়ানরা মিথ্যে কথা বলে ভোট আদায় করে, তারা চরিত্রহীন না ? যারা ঘুষ খায়, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে কবচ-মাদুলী দেয়, যারা বিধবার সম্পত্তি মেরে ধনী হচ্ছে, যারা পরনিন্দা-পরচর্চা করে, পরশ্রী-কাতরতায় জ্বলে-পুড়ে মরে, তারা চরিত্রহীন না ?

বিমান গেলাসের হুইস্কীটুকু একেবারে গলায় ঢেলে দিয়েই প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলে যায়, শুধু দেহটা নিয়েই যদি চরিত্রবান হওয়া যেত, তাহলে সব ব্যায়ামবীর আর স্বাস্থ্যবান মানুষই চরিত্রবান হতেন, শ্রদ্ধেয় হতেন কিন্তু তা তো নয়। আসলে মানুষের মনই হচ্ছে চরিত্র।

মালা দু'হাত দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে একটা চুমু খেয়ে একটু হেসে বলে ঠিক বলেছ !

দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে শুয়ে শুয়েও কথা হয়। বিমান বলে, বলতে পারো মালা, কখনও কী তোমার মনে হয়েছে, রাজলক্ষ্মী বা চন্দ্রমুখী চরিত্রহীন ?

সত্যিই মনে হয়নি।

ভালবাসার আগুনে সব পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

কিছুটা লোভে, কিছু মোহে আর খানিকটা নেশার ঘোরে বাদখালে মালার কপালে প্রথম আগুন লাগে। তুষের আগুনের মত একটা পাপবোধ সব সময় ওর মনের মধ্যে ধিক ধিক করে জ্বলেছে কিন্তু আজ ? সারা রাত্তির ভালবাসার মানস সরোবরে ডুব দিয়ে ও যেন নারীধর্মের নতুন মন্ত্রে দীক্ষিতা হল।

॥ দশ ॥

দাদা-বৌদির সঙ্গে গিয়ে কো-অপারেটিভের অফিসের সমস্ত কাজকর্ম শেষ করে সুদীপ যখন বোসপাড়ার বাসায় পৌঁছল, তখন প্রায় তিনটে বাজে। আগে ঠিক করেছিল, চটপট খেয়েদেয়ে একবার হোটেলে ঘুরেই সোজা এয়ারপোর্ট চলে যাবে। একটা চান্স নেবে। যদি সীট পায়, তাহলে চলে যাবে, নয়তো আরও একটা রাত কলকাতাতেই কাটাবে।

মা ওকে দেখেই বললেন, কত বেলা করে এলি! তোর মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

সুদীপ হেসে বলল, তুমিও তো না খেয়ে বসে আছো। তোমার মুখখানা শুকোয়নি?

আমি বাড়িতে বসে আছি আর তুই এই দুপুরে রোদ্দুরে কত জায়গা ঘুরে এলি।

সুদীপ দু'হাত দিয়ে মায়ের মুখখানা ধরে বলে, তুমি এখনো ভাবো, আমি সেই ছোট্ট বাচ্চা আছি।

মা ওকে খেতে দেবার জন্য রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েই বলেন, না, না, তুই ভীষণ বুড়ো হয়েছিস!

এ সংসারে এখন আর সেই অভাব-অনটন নেই। সুদীপ অটোয়াল সাহেবের কোম্পানিতে চাকরি পাবার পর এই সংসারের চেহারা বদলে গেছে। তাছাড়া দু'ভাইই তো বাইরে। শুধু বাবা-মা এখানে। সুতরাং খরচপত্তরও কমেছে।

কতদিন পর আবার সেই রান্নাঘরে, আবার মায়ে-পোয়ে খেতে বসেছে। ছেলে যা যা ভালবাসে, উনি সবকিছু রান্না করেছেন। সুদীপ একটু হেসে বলে, তুমি আর কিছু রান্না করতে পারলে না?

কী আর এমন রান্না করেছি? তুই যা ভালবাসিস, তাই একটু-আধটু করেছি। উনি একটু থেমে বলেন, তোরা দু'ভাই কাছে নেই

বলে ভাল-মন্দ রান্না করতেও ইচ্ছে
তোকে নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াচ্ছি। বললেন, খুব ভাল

এ সংসারে কিছু কিছু মানুষ আছেন, যারা গাছকে গা
আকাশে মেঘের খেলা যাদের চোখে পড়ে না, গোধূলির সো
আলোয় মন আনমনা হয় না, গিরিরাজ হিমালয় বা অনন্ত দিগন্ত বিস্তৃত মহাসিন্ধু দেখে মন উদার হয় না। এদের মধ্যে বহু বিচক্ষণ বুদ্ধিমান সংসারী পাওয়া যাবে। এরা প্রত্যেকটি আলু-পটল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টিপে-টুপে দেখেশুনে বাজার করেন, নিয়মিত ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দেন, ব্যাঙ্কে রেকারিং ডিপোজিট একাউন্ট খোলেন, বিবেকহীন স্ত্রীর মোসাহেবী করে সাংসারিক জীবনে সিদ্ধিলাভ করেন। এরা মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে জানেন, ভাবেন, বাবা-মার যৌন আনন্দেই সন্তানের জন্ম কিন্তু একবার একটি মুহূর্তের জন্যেও কী তারা ভেবে দেখেছেন, সেই ক্ষণিক যৌন আনন্দের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে থাকে এই স্নেহ, এই ভালবাসা, এই কল্যাণ কামনা? যুগে যুগে এই বিশ্ব-সংসারের বহু বিদ্বান বুদ্ধিমানই অতল গহ্বর সমুদ্রের রহস্যের আবিষ্কার করেছেন, মহাকাশের অজ্ঞাত ইতিহাস লিখেছেন, ধরিত্রীর গভীরতম কেন্দ্রের চরিত্র জেনেছেন কিন্তু মাতৃস্নেহের সীমাহীন ঔদার্যের ইতিহাসে আজো কেউ আবিষ্কার করতে পারলেন না।

সুদীপ অবাক বিস্ময়ে একবার মুহূর্তের জন্য মায়ের দিকে তাকায়। মনে মনে ভাবে, দরকার নেই আমার অটোয়াল সাহেবের চাকরি, গেস্টহাউসের ঐ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেরও কোনো প্রয়োজন নেই। সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে আসি এই বোসপাড়ার ভাঙা বাড়িতে। এমন মাকে কাছে পেলে আর কী চাই?

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই মা জিজ্ঞেস করলেন, মালা আর বিমানদের বাড়ি যাবি তো?

হ্যাঁ যাব কিন্তু খালি হাতে তো যাওয়া উচিত না, তাই····

হ্যাঁ, কিছু হাতে নিয়ে যাওয়া তো একশ'বার উচিত। তাছাড়া দিল্লীতে যাবার পর এই প্রথম····

নে আনি।

াকে নিয়েই বেরুল। সবার আগে
দোকানে ঢুকেই সুদীপ বলল, সুধাংশুবাবু,
একটা হার চাই।

বলেন, তোর কী মাথা খারাপ হয়েছে? আমি
এই

সুধাং হেসে বললেন, মাসীমা, এই বয়সে ছেলেমেয়ের হুকুমই শুনতে হয়।

মালা আর বৌদির জন্যও দুটো হার কেনা হল। মা খুব খুশি হয়ে বললেন, খুব ভাল করলি। কত ভাগ্য করে তুই এমন দাদা-বৌদি পেয়েছিস।

আরও কত কি কিনল! বাবা-মার জামা-কাপড়, দুটো বিছানার চাদর, বাবার একজোড়া চটি, মালা আর বিমানের মার জন্য দুটো শাড়ি। আরও টুকটাক কত কি! সব শেষে সুদীপ মার হাতে দু'হাজার টাকা দিয়ে বলল, জীবনে তো কোনো দিন নিজের ইচ্ছে মত দু'পাঁচ টাকাও খরচ করতে পারোনি। এই টাকা দিয়ে যখন যা ইচ্ছে হবে....

মা ঝর ঝর করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন, ওরে, এত সুখ কী আমার কপালে সইবে?

সুদীপও চোখের জল সামলাতে পারে না। তবু কোনোমতে বলে, মা, তুমি চোখের জল ফেলো না। শুধু আমাকে একটু বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করো।

সবার বাড়ি ঘুরে-ফিরে মার কাছে খাওয়া-দাওয়া করে হোটেলে ফিরতে অনেক রাত হল। একটু পরেই অটোয়াল সাহেবের টেলিফোন এলো, কী সুদীপ্তবাবু, জমি-টমি কিছু দেখলেন?

সুদীপ বেহালার ফ্ল্যাটের সব খবর দিতেই উনি বললেন, খুব ভাল কাজ করেছেন। ইউ হ্যাভ টেকেন দ্য ওয়াইজেস্ট ডিসিশন।

স্যার, সবই তো আপনার কৃপায়।

নো, নো, সার্টেনলি নট! আপনি কোম্পানির সুনাম আর বিরাট ক্ষতি বাঁচিয়েছেন বলেই এই টাকাটা পেয়েছেন।

একটু পরেই বিমানের ফোন, কিরে হতভাগা, কোথায় সারাদিন ছিলি?

তুই এর আগে ফোন করেছিলি নাকি?

একবার না, চারবার। একটু আগেই তো দেখলাম, তোর লাইন বিজি।

হ্যাঁ, অটোয়াল সাহেব ফোন করেছিলেন।

তুই কবে ফিরছিস? কাল?

সুদীপ মনে মনে ঠিক করেছিল, কালই যাবে কিন্তু কী জানি কী কারণে বলল, না, না, এখনও অনেক কাজ আছে। হয়তো আরো দু'তিন দিন এখানে থাকতে হবে।

বিমান হাসতে হাসতে বলল, ওরে শালা, আমি কী তোর বউয়ের চৌকিদারী করেই দিন কাটাব?

সুদীপও একটু হেসে বলে, ওরে, মালার মত বন্ধু-স্ত্রীর চৌকিদারী করাও তো সৌভাগ্যের ব্যাপার!

তা তো বটেই! তুই মালাকে কী ভাবিস? গ্রেটা গার্বো না এলিজাবেথ টেলর?

মোর ইন্টারেস্টিং দ্যান দ্যাট! প্রায় না থেমেই সুদীপ বলল, আমার প্রেয়সী-কাম-জীবন দেবতা কোথায়?

দাঁড়া, দাঁড়া, ডেকে দিচ্ছি। বিমান একটু হেসে বলল, ওরে শালা, এত রাত্তিরে যদি তোর স্ত্রী আমার ঘরে থাকতো, তাহলে আর আমার দুঃখ কী ছিল?

হ্যাঁ, একটু পর মালার সঙ্গেও অনেক কথা হলো। ওর আর বিমানের মাকে দুটো খুব ভাল শাড়ি দিয়েছে জেনে খুব খুশি হলো।

সুদীপ অনেককিছু বললেও সবকিছু বলল না, বলতে পারল না।

তুমি কবে আসছ ?

কী করে বলি ? অটোয়াল সাহেবের কাজগুলো তো আজ কিছুই হলো না। ঠিক বলতে পারছি না, তবে বোধহয় আরো দু'তিন দিন কলকাতায় থাকতে হবে।

মালা বলল, যাইহোক তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসো। সারাদিন ত বোবা হয়ে থাকি, তারপর····

সুদীপ ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলল, মাঝে মাঝে এমন বিচ্ছেদ-বিরহ তো ভালই !

ক'পেগ টেনেছ যে এত রোমান্টিক হয়ে গেলে ?

এক পেগও না, একটু আগেই তো বাড়ি থেকে এলাম।

পরের দিন সকালে হোটেল থেকে বেরিয়েই প্রথমে ইভনিং ফ্লাইটে নিজের সীটটা কনফার্মড করে নিয়েই সোজা চলে গেল নৈহাটি আর কল্যাণী। অভীক ত ওকে দেখে অবাক। বলল, আমি ত ভেবেছিলাম তোরা দুজনে আমাকে ভুলে গেছিস।

আমাকে তুই এত অকৃতজ্ঞ ভাবতে পারলি ?

না, না, তা না কিন্তু····

অভীক সঙ্গে সঙ্গে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। হাতে বেশি সময় ছিল না, তবু কল্যাণীতে প্রত্যেকের বাড়িতেই পাঁচ-দশ মিনিট কাটাল। সবাই খুশি। শুধু তাই নয়। অনেকেই বললেন, এখান থেকে কলকাতায় চলে গেলেও কেউ আর মনে করে দেখা করতে আসে না।

সুদীপ না, অভীকই ওদের জবাব দেয়, ডোণ্ট ফরগেট দিস ফেলো ইজ মাই ফ্রেণ্ড আর এ হতভাগার বউ আমার ছোট বোন।

অভীককে নিয়েই সুদীপ হোটেলে ফিরল। গাড়িতে দু'জনের কত কথা! গোছগাছ করাই ছিল। সুতরাং বিশেষ দেরি হলো না। বিলপত্তর সই করেই ছুটল বোসপাড়া। এক মিনিটের জন্য বাড়িতে ঢুকে মাকে প্রণাম করেই সোজা এয়ারপোর্ট !

ফ্লাইট সাড়ে পাঁচটায়। ওরা এয়ারপোর্ট পৌঁছল প্রায় পাঁচটা

নাগাদ। এয়ারপোর্টে পৌঁছেই শুভ সংবাদ জানা গেল, প্লেন এখনও গুয়াহাটি থেকে ছাড়ে নি, সুতরাং নিদেন পক্ষে সাড়ে সাতটার আগে দিল্লী ফ্লাইট ছাড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। দুই বন্ধুই মহা খুশি। সুদীপ বলল, চল, চল, ওপরে রেস্টুরেন্টে বসে আড্ডা দিই।

সত্যি বহুদিন পর ওরা এমন প্রাণভরে আড্ডা দিল। দু'জনেরই মনে কত কথা জমে ছিল! বোধহয় রাতভোর কথা বললেও ওদের কথা শেষ হতো না। মানুষের মনে সব সময়ই কত দুঃখ-কষ্ট-মান-অভিমানের ছোট ছোট টুকরো টুকরো কালো মেঘ জমা হচ্ছে। হয়। মনের মানুষ, প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে কথা বললে সে-সব কালো মেঘ উড়ে যায়।

শেষপর্যন্ত গুয়াহাটি থেকে প্লেন এলো প্রায় সাড়ে সাতটায়। দিল্লীর পথে আকাশে উড়ল প্রায় পৌনে ন'টায়। তা হোক। সুদীপ অনেক অনেক অভাবিত তৃপ্তি আর শান্তি নিয়েই কলকাতা ছাড়ল।

না, পালামে কেউ ওকে অভ্যর্থনা করতে আসে নি। তাই লগেজ ছাড়িয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সুদীপ গেস্ট হাউস রওনা হলো। রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারটা।

পনের-বিশ মিনিটের মধ্যেই গেস্ট হাউসের সামনে এসে ট্যাক্সি থামল। দোতলা অন্ধকার। একতলায় বিমানের ঘরে আলো জ্বলছে। দু'টি ফ্ল্যাটের দুটি আলাদা বেল। সুদীপ একবার ভাবল বিমানের ফ্ল্যাটের বেল বাজায় কিন্তু কী একটা দ্বিধায় পারল না। ওপরের ফ্ল্যাটের বেল দু'তিনবার বাজিয়েও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বুঝতে অসুবিধে হলো না, মালা দেবী ওপরে নেই। ট্যাক্সির ড্রাইভারও এদিক-ওদিক উঁকি দিতে দিতে বলল, সাব, নীচের ঘরে ত এক সাহেব-মেমসাহেবকে দেখা যাচ্ছে। ওদের বললে····

সুদীপ আগেই দেখেছিল কিন্তু মুখে বলল, আমি আর আমার এক দোস্ত ওপরের ফ্ল্যাটে থাকি। মনে হচ্ছে, আমার ঐ দোস্তটি

ফ্যাক্টরীতেই আটকে পড়েছে। ও একটু হেসে বলল, নীচের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার আলাপই নেই, সুতরাং ওদের বিরক্ত করা তো ঠিক না।

সাব, আভি কাহা জানা?

ওবেরয় ইণ্টার-কন্টিনেণ্টাল।

হোটেল ত নয়, যেন সম্পদ-সম্ভোগের মহাতীর্থ! মানুষের সুখের জন্য, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, সীমাহীন আয়েস আর আনন্দের জন্য কত কি ছড়িয়ে রয়েছে কিন্তু তবু সুদীপ সারারাতের মধ্যে একটি মুহূর্তের জন্যও দু'টি চোখের পাতা এক করতে পারল না। কী একটা অব্যক্ত বেদনা আর জ্বালায় ছটফট করল রাতভোর। কখনো শুয়েছে, কখনো বসেছে, আবার কখনও কখনও ঘরের মধ্যে পায়চারি করেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আকাশ-পাতাল কত কি ভেবেছে। ভাল-মন্দ সবকিছু ভেবেছে। কখনো কখনো আপনমনে চোখের জল ফেলেছে। পর্দা সরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকার পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় মন-প্রাণ ভরে গেছে। অবিশ্বাস করেছে সমস্ত মানুষকে।

কখন যে রাতের অন্ধকারের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে, তা সুদীপ বুঝতেও পারে নি। হঠাৎ সমস্ত পৃথিবীর অন্ধকারকে কোনো এক অজানা মহাসাগরে বিসর্জন দিয়ে পুবের আকাশ রাঙিয়ে উঠল অংশুমান জ্যোতির্ময়। বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে পুবের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, ওর সর্বমঙ্গলা চিরকল্যাণী মা যেন ওর সর্বাঙ্গে কল্যাণ হাতের অমৃত স্পর্শ বুলিয়ে দিলেন।

না, সুদীপ আর এক মুহূর্তের জন্যও স্থির থাকতে পারল না। এক অবিস্মরণীয় অনাস্বাদিত আনন্দে ঔদার্যে মন ভরে গেল। মনে হলো, যে মহাশক্তি সারা পৃথিবীর এই জমাট বাঁধা অন্ধকার দূর করতে পারেন, দরিদ্রের কুটির থেকে গহন অরণ্যে আলো ছড়িয়ে দেন, লক্ষ কোটি রোগীর দেহ থেকে রোগ-যন্ত্রণা বিদায় নেয়, তার কৃপায় সামান্য মানুষের মনের দৈন্য দূর হবে না?

সারা রাত্রির ব্যথা-বেদনা-ঘৃণা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। মনে হলো, শুধু মালা বা বিমান না, এই বিশ্ব-সংসারের মধ্যে কেউ খারাপ না, কেউ ঘৃণার পাত্র-পাত্রী না। যে চুরি করে, তার কী সন্তান স্নেহ নেই? যে বেশ্যাবৃত্তি করে দু'মুঠো অন্ন আর বস্ত্রের সংস্থান করে, সে কী মা না? না, না, এই পৃথিবীর সবাই ভাল, সবাই পবিত্র। তাছাড়া অন্ধকারের যন্ত্রণা ভোগ না করলে কী ভোরের আলো দেখা যায়? মালাকে একটু বুকের মধ্যে পাবার জন্য সুদীপ পাগলের মত ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।